মনীষীজীবন ও বিচিত্র প্রসঙ্গ

শৈলেনকুমার দত্ত


আশা প্রকাশনী

MANISI-JIBAN O BICHITRA PRASANGA

A Collection of Essays in Bengali

By

Sailen Kumar Dutta

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৫৭

প্রকাশক

শীলা ভট্টাচার্য

আশা প্রকাশনী

৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :

শ্রীদিলীপকুমার দে

দে প্রিণ্টার্স

১৫৭বি, মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট,

কলকাতা ৭০০ ০০৬

জীবনীপাঠের প্রথম দীক্ষা যাঁর কাছে
আমার সেই পরম পূজনীয় পিতৃদেব
শ্রীনিমাইচরণ দত্ত
শ্রীচরণেষু

এ সংকলনের প্রতিটি রচনা ইতিপূর্বে প্রকাশিত। গ্রন্থভুক্তির সময় কয়েকটি রচনা পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা হয়েছে, দুতিনটি নতুন করে লেখা। প্রবন্ধগুলি রচনার সময় প্রায় তিনশতাধিক জীবনী ও আত্মজীবনীর সাহায্য নিয়েছি। এঁদের স্বতন্ত্রভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা সম্ভব নয়, তাই সকলকেই এই সুযোগে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। প্রসঙ্গের খাতিরে দুএকটি তথ্য রচনার মধ্যে একাধিকবার এসেছে, এক্ষেত্রে আমি নিরুপায়।

মনীষীদের কর্মভূমি ছিল অখণ্ড বঙ্গদেশ, রচনার মধ্যে তাই 'বাংলাদেশ' ব্যবহার করেছি।

রচনাগুলি বেশির ভাগই রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাকীগুলি দেশ, অমৃত ও যুগান্তর সাময়িকীতে। গ্রন্থভুক্ত করার সময় কিছু কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।

ছাপার পর দু একটি মুদ্রণপ্রমাদও থেকে গেছে। কোন কোন জায়গায় আকাংক্ষা আকাংখা ছাপা হয়েছে, আর ৫৮ পৃষ্ঠায় মেরী শেলী রচিত কাব্যের নাম ছাপা হয়েছে Zodore। ওটা Lodore হবে।

অলমতি...

শৈলেনকুমার দত্ত

সূচীপত্র

বাঙালি মনীষীর ভোজনবিলাস	৯
বাঙালি মনীষীর খেলাধূলা	১৪
বাঙালি মনীষীর বিচিত্র নেশা	১৮
হৈমবতী ও বাঙালি মনীষী	২৫
বাঙালি মনীষীর নাট্যাভিনয়	২৯
বাঙালি মনীষীর উদ্ভিদচর্চা	৩৫
বাঙালি মনীষীর সঙ্গীতসাধনা	৩৯
প্রেততত্ত্ব ও বাঙালি মনীষী	৪৩
বাঙালি মনীষীর ব্যবসাবাণিজ্য	৪৭
বাঙালি মনীষীর সভাসমিতি	৫০
বাঙালি মনীষীর তাস খেলা	৫৫
বাঙালি মনীষীর প্রণয়	৫৮
বাঙালি মনীষীর বিচিত্র বাতিক	৬৪
মনীষীদের বিচিত্র রুচি	৬৭
বাঙালি মনীষীর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ	৭১
বাঙালি মনীষীদের নিয়ে রঙ্গ ব্যঙ্গ	৭৪
মনীষীদের নিত্যসঙ্গী	৭৮
মনীষীদের জীবজন্তু	৮২
অবিশ্বাস্য স্মৃতিশক্তি	৮৭
বিশ্বখ্যাত কেরানী	৯১
খ্যাতির বিড়ম্বনা	৯৩
শেষ দৃশ্য	৯৭
বিচিত্র সমাধি লিপি	১০৩

বাঙালি মনীষীর ভোজনবিলাস

শুধু প্রতিভায় নয়, মনীষী-জীবন সব দিক থেকেই বিস্ময়কর। ভোজন-রসেও তাঁরা যে কি পরিমাণ রসিক ছিলেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। এক একজন মনীষী এত প্রচুর পরিমাণে ভোজন করতে পারতেন যে, সেখানেও তাঁরা সাধারণের অনেক ঊর্ধ্বে!

রাজা রামমোহন রায় শারীরিকভাবে যেমন দীর্ঘকায় বলশালী ছিলেন, তিনি খেতেও পারতেন তেমনি প্রচুর পরিমাণে। সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত হানবার সময় বাংলাদেশে অনেকে তাঁর শত্রু হয়ে উঠেছিলেন। কয়েকবার তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও হয়। কোন এক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করতে গেলে তিনি হেসে তাকে জবাব দেন—'আমাকে হত্যা করবে, কি খায় তারা?'

বস্তুত তিনি অসাধারণ খেতে পারতেন। তিনি একটি গোটা পাঁঠার মাংস একলাই খেয়ে ফেলতেন। একসঙ্গে পঞ্চাশটি আম, এক কাঁদি নারকেল না হলে তাঁর ফল খাওয়াই হত না। সারাদিনে তিনি বারো সের দুধ পান করতেন। এজন্যে বিলেত যাওয়ার সময়েও তিনি একটি দুগ্ধবতী গাভী সঙ্গে নিয়ে গেছলেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ প্রচুর পরিমাণে খেতে না পারলেও খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর অনেক বিলাসিতা ছিল। খাওয়াদাওয়ার সময় তিনি বন্ধু-বান্ধব-পরিবৃত নাহয়ে খেতে বসতেন না। বিলেতে একবার একটি ভোজসভায় তিনি চার্লস ডিকেন্স, উইলিয়ম থ্যাকারে, মার্ক লেমন প্রভৃতি সাহিত্যিকদের সঙ্গে একত্রে বসে প্রচুর আহার করেছিলেন। দ্বারকানাথের এই গুণটি উত্তরাধিকারসূত্রে দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন। মহর্ষিদেবও রামমোহনের মত প্রচুর পরিমাণে দুধ পান করতে পারতেন। মরী পর্বতে থাকাকালীন দেবেন্দ্রনাথ যে গরুটি পুষেছিলেন, সে দশ-বারো সের দুধ দিত। দেবেন্দ্রনাথ একলাই সে-দুধ পান করতেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব পরিবর্তনপ্রিয় ছিলেন। তিনি যেমন এক ঘরে বেশিদিন থাকা পছন্দ করতেন না, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও তেমনি এক রান্না দুদিনের বেশি খেতেন না। কবির পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী একস্থানে লিখেছেন—'নিত্য নূতন রান্না হলে তিনি ভারি খুশি হতেন, তাছাড়া নিজেও নানাপ্রকারের রন্ধনতালিকা আমাদের বলতেন; সেই তালিকা অনুসারে রান্না উতরে গেলে তাঁর স্ফূর্তি হোত।'

বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ খাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ছিলেন। তিনি শুধু প্রচুর পরিমাণে খেতেন তা নয়, পছন্দের ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট উদারতা ছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথম জীবনে মাংসাহারে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাঁর—'আত্মচরিতে' নিজেই মুক্তকণ্ঠে সে-কথা স্বীকার করেছেন—'মাংসাহারে এমনই আসক্তি ছিল যে, ভবানীপুরের চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ীতে বাসকালে প্রায় প্রতি রবিবার যখন কালীঘাট হইতে জীবন্ত পাঠা আসিত, সে পাঠার ডাক শুনিলেই আমার পড়াশোনা বন্ধ হইত। তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া রাঁধিয়া পেটে না পুরিতে পারিলে আর কিছু করিতে পারিতাম না।'

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খুব ভোজনবিলাসী ছিলেন। তাঁর জীবনচরিতে বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে লিখেছেন—'ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর দ্বার অবারিত ছিল। দুই বেলাই ক্রমাগত উনুন জ্বলিত, যে আসিত সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মীয় ও ধনী লোকদিগকে আহার করাইতেন।' তাঁর এই ভোজনবিলাস তাঁর কাব্যেও সুপরিস্ফুট হয়েছে। বাঙালির খাদ্যবস্তু নিয়ে তাঁর যেমন গর্ব এবং আনন্দের সীমা ছিল না তেমনি সেগুলি প্রকাশ করতেও তাঁর আন্তরিকতায় কোন ফাঁকি ছিল না। পাঁঠা, তপসে মাছ, আনারস, পৌষপার্বণ প্রভৃতি কবিতা ছাড়াও তাঁর 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য' সুদীর্ঘ কবিতাটি বাঙালির খাদ্যবস্তুর একটি সম্পূর্ণ তালিকা।

খাদ্যরসিক ঈশ্বরচন্দ্র যে ভোজনরসিকও ছিলেন, তাঁর কাব্যপাঠেও সে-কথা জানা যায়। পাঁঠার 'অস্থিস্থিত মজ্জা' চুষতে তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন, তাই রঙ্গ করে লিখেছেন—

মজ্জাদাতা অজা তোর—কি লিখিব যশ।
যত চুষি তত খুশী হাড়ে হাড়ে রস॥

কবি-দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার পাঁঠার হাড়ের (মাংসের নয়)

অম্বলের মর্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁর 'গুম্ফ-আক্রমণ কাব্যে' একস্থানে লিখেছেন—

বৃহৎ রূপার থালে পাচক ব্রাহ্মণ ঢালে
মাংসের পোলাও গাদা গাদা।
কি গুণ পাঁঠার হাড়ে অম্বলের তার বাড়ে
কে বুঝিবে ইহার মর্যাদা ॥

ডেভিড হেয়ার সাহেবের জন্ম স্কটল্যাণ্ডে হলেও, তিনি এদেশে বাস করে আহারে আচারে পুরোপুরি বাঙালি হয়ে উঠেছিলেন। তার সর্বাধিক প্রিয় পানীয় ছিল দুধ আর নারকেল। তিনি মাগুর মাছ খেতেও ভীষণ ভালবাসতেন। তাঁর প্রিয়বন্ধু রামমোহন রায়ের কাছে তিনি মাগুর মাছ খেতে শিখেছিলেন।

প্যারীচরণ সরকারের দেহ যেমন নিরাময় ও পরিশ্রমপটু ছিল, তিনি খেতেও পারতেন তেমনি প্রচুর পরিমাণে। তিনি প্রথম যৌবনে এত খেতে পারতেন যে, এখন শুনলে উপকথা মনে হয়। বারাসতে থাকাকালীন এক নিমন্ত্রণসভায় তিনি সকলের চেয়ে বেশি খেয়েছিলেন—তারপর সকলের মধ্যে তর্ক হয় কে কটা ছানাবড়া খেতে পারে। বারাসতের উৎকৃষ্ট ছানাবড়ার তখন খুব নামডাক ছিল। তর্কের খাতিরে কেউ একখানা, কেউ আধখানা খেয়েছিলেন, প্যারীচরণ কিন্তু এক সের ছানাবড়া খেয়ে ফেলেছিলেন অম্লানবদনে। তিনি যৌবনে এক ধামা মুড়ি ও শ'খানেক মুলো খেয়ে জলপান করতেন। তিনি মাংসও খেতে পারতেন প্রচুর। তাঁর অকৃত্রিম সুহৃদ বিদ্যাসাগরও এ বিষয়ে তাঁর সহযোগী ছিলেন। বারাসতে নবীনকৃষ্ণ মিত্রের বাড়িতে ছাগল কাটা হলে তিনি অর্ধেক খেতেন, বিদ্যাসাগর শেষ করতেন আর অর্ধেক। রান্না বেশির ভাগ সময়েই করতেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর শুধু ভাল খেতেই পারতেন না, রন্ধনেও পারদর্শী ছিলেন। বর্ধমানে বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের বাড়িতে অতিথি হয়ে তিনিই রান্না-বান্না করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র-সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি মহারথীরা বিদ্যাসাগরের রান্না খেতে খেতে মশগুল হয়ে গল্প করতেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও খুব ভোজনপটু ছিলেন। তিনি যৌবনে পরিতৃপ্তির সঙ্গে পেটভরে পোলাউ মাংস খেয়ে স্বচ্ছন্দে দু'সের রসগোল্লা খেতে পারতেন। তিনি কচি পাঁঠার মাংস, ইলিশ-চিতল-কই প্রভৃতি মাছও প্রচুর

খেতেন। আর যাঁর হাতের রান্না চিত্তরঞ্জনের সবচেয়ে প্রিয় ছিল, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী।

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর সম্পর্কে একস্থানে লিখেছেন—'যৌবনকালে খুব পরিতৃপ্তির সহিত পেট ভরিয়া পোলাউ, মাংস ইত্যাদিতে উদর পূর্ণ করিয়াও স্বচ্ছন্দে দুই সের রসগোল্লা খাইয়া ফেলিতে পারিতেন।'

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ একবার বসে তিন চারজনের আহার খেয়ে ফেলতেন। তিনি খেয়ে উঠে প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতেন—'প্রচুর আহারই আমার কর্মের একমাত্র উৎস।' হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের প্রত্যহ রাত্রে মাংস না হলে চলত না।

কবিগুরুর 'সকল গানের কাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভক্ত ছিলেন শুঁটকি মাছের। তিনি একবাটি পায়েস খেয়েও মুখশুদ্ধি করতেন শুঁটকি মাছ খেয়ে। শান্তিনিকেতনে শুঁটকি মাছের আর একজন ভক্ত হলেন অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেন।

বাংলা গদ্যের অমর শিল্পী রামকমল সেন ছিলেন নিরামিষাশী। তিনি জিলিপি খেতে খুব ভালবাসতেন। স্যার আশুতোষও নিরামিষাশী ছিলেন। তবে তাঁর সন্দেশ খাওয়ার গল্প প্রায় উপকথায় পরিণত হয়েছে। অতুলপ্রসাদ শুধু ভোজনপটু ছিলেন না, সকলকে নিয়ে একত্রে আহার না করলে তাঁর পূর্ণ তৃপ্তি হত না। অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণও ভোজনপটু ছিলেন।

আহারের ব্যাপারে এক একজন মনীষীর আবার এক একটি জিনিসের ওপর আগ্রহ বেশি ছিল। স্যার রাসবিহারী ঘোষ ভক্ত ছিলেন কুলপি বরফের। রামকৃষ্ণদেবও কুলপি বরফ খেতে ভালবাসতেন। তিনি আর একটি জিনিস পছন্দ করতেন, সেটি হল—বোঁদে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও বোঁদে ভালবাসতেন। মধুসূদন ভালবাসতেন মোচার ঘণ্ট, স্যার গুরুদাস ভক্ত ছিলেন পাকা আমের। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল ডালবাটা-সিদ্ধ। যদুনাথ সরকার গরম জিলিপি ও হালুয়া ভালবাসতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মানকচু আর বড়ি খেতে ভালবাসতেন। তিনি মৃত্যুর এক বছর আগে পর্যন্ত নিজের হাতে বড়ি দিয়েছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ভালবাসতেন ভিজে ছোলা। শহীদ কানাইলাল ছিলেন দুধের ভক্ত। তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন—'তিনি প্রত্যহ আড়াই সের দুধ পান করতেন।'

কবি সুকুমার রায় শুধু যে 'খাই খাই' প্রভৃতি কবিতাই লিখেছিলেন তাই

নয়, তিনি খাওয়ার ব্যাপারেও খুব বিলাসী ছিলেন। তাঁর বাড়িতে 'মন্‌ডে ক্লাব' বলে যে রসচক্রটির প্রতিষ্ঠা হয়, অনেকে বলেন এই রসচক্রের আদি নাম ছিল মণ্ডা ক্লাব। খাওয়াদাওয়ার আতিশয্যের কথা ভেবেও এই নাম হওয়া বিচিত্র নয়। এই সমিতির উল্লেখযোগ্য সভ্য ছিলেন—অতুলপ্রসাদ সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমল হোম, কালিদাস নাগ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ণিমা মিলন' সাহিত্যসভার অনুষ্ঠানশেষেও এরূপ খাওয়া-দাওয়ার রীতি ছিল।

কান্তকবি রজনীকান্তও খুব ভোজনবিলাসী ছিলেন। তাঁর জননী মনোমোহিনী দেবী রন্ধনশিল্পে অসাধারণ দক্ষতালাভ করেছিলেন। এ-জন্যে রজনীকান্তের পিতা তাঁকে 'রান্নার জজ' বলে ডাকতেন। মনোমোহিনী দেবীর হাতে তৈরী পুলিপিঠা শুধু রজনীকান্তই নয়, সেকালের অনেকের কাছেই অত্যন্ত লোভনীয় বস্তু ছিল।

আজ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও অস্তমিত। অথচ খাদ্যবস্তু জীবনের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। একজন বিদেশী পুষ্টিবিশেষজ্ঞ একবার বলেছিলেন—'Tell me what you eat, I shall tell you what you are।'

আজ আমরা জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে যুগান্তকারী প্রতিভার অভাব অনুভব করছি—এই সব প্রতিভার অভাবের মূলে যে খাদ্যের অস্বচ্ছলতাই প্রধান কারণ নয়, তাই বা কে বলতে পারে!

বাঙালি মনীষার খেলাধুলা

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে All work and no play makes Jack a dull boy। শুধু কাজ, শুধু পড়াশোনা নিয়ে জীবন পূর্ণ হয় না। মজবুত শরীর এবং মন প্রফুল্ল রাখতে প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু খেলাধূলার প্রয়োজন হয়। বাঙালি মনীষীদের কর্মবহুল বিরাট বিশাল জীবনের আড়ালে খেলাধূলা ছিল বলেই হয়তো তাঁরা তাঁদের প্রেরণার শিখাটি অনির্বাণ রাখতে পেরেছিলেন।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র-বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-বিবেকান্দ-রজনীকান্ত-অরবিন্দ-সুভাষচন্দ্র সকলেই কিছু-না-কিছু শরীরসাধনা করেছেন। একটা দৃশ্য ভাবতে মন্দ লাগে না—সংস্কৃত কলেজের সংলগ্ন মাটিতে বিদ্যাসাগর তাঁর অন্যান্য বন্ধুবর্গ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, তারাশঙ্কর তর্করত্ন ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে একসঙ্গে কুস্তীর মহড়া দিচ্ছেন অথবা মুগুর ভাঁজছেন। তথ্যটি কিন্তু নির্ভুলভাবে সত্য। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক থাকাকালীন বিদ্যাসাগর নিজে এই কুস্তীর আখড়াটি স্থাপন করেন এবং এখানেই অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত ব্যায়াম করতেন, মুগুর ভাঁজতেন, মাঝে মাঝে কুস্তীও করতেন। রামমোহন নিষ্ঠার সাহায্যে শুধু বিশাল দেহেরই অধিকারী হননি; অসাধারণ বলশালী হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের অন্যতম সুহৃদ অক্ষয়কুমার দত্ত ব্যায়াম করতেন ঠাকুর-বাড়িতে। অক্ষয়কুমার তাঁর বিখ্যাত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মনের প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' গ্রন্থে শরীর-চালনার যে নিয়ম-পদ্ধতি প্রচার করেন; সেই পদ্ধতিতেই এখানে ব্যায়ামচর্চা শুরু হয়। অক্ষয়কুমার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ প্রভৃতি মনীষীরা এখানে এই প্রণালীতে নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। ব্রাহ্মসমাজের আর এক ঋত্বিক শিবচন্দ্র দেবও স্নানের পর নিয়মিত ডাম্বেল ভাঁজতেন।

ঠাকুরবাড়িতে শরীরচর্চার রীতি অবশ্য আগেও ছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন একজন সৌখিন কুস্তীগীর। এই আখড়ায় ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকটি ছেলেকে কুস্তী করতে হত। সত্যেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই এই কুস্তীর

কথা স্মৃতিকথায় লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বাল্যকথায় লিখেছেন—'হীরা সিং বলে এক পালওয়ানের কাছে আমরা কুস্তী শিখতুম, তাতে আমার খুব উৎসাহ ছিল। ডনের পর ডন, বড় বড় মুগুর ভাঁজা আর কত রকমের কুস্তীর দাঁও, মার-পেঁচ শিক্ষা। আমি কুস্তীতে একজন ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলুম। কেউ আমার সঙ্গে পেরে উঠত না।'

কবি-দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সাঁতারেও পটু। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'বড় দাদা সাঁতারে সর্বাপেক্ষা মজবুত ছিলেন। যখন গঙ্গার ধারে বাগানে থাকতেন তখন মাঝে মাঝে সাঁতার দিয়ে গঙ্গাই পার হতেন।' সেজ হেমেন্দ্রনাথ শুধু নিজেই ব্যায়াম করতেন না, অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে মুগুর ভাঁজা, ডন দেওয়া, সাঁতার-দেওয়া প্রভৃতি শেখাতেন।

রবীন্দ্রনাথও অবশ্য সাঁতারে খুব দক্ষ ছিলেন। 'ছেলেবেলা' স্মৃতিকথায় কবি নিজেই লিখেছেন—'বড়ো বয়সে যখন শিলাইদহের চরে থাকতুম, তখন একবার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পেরিয়েছিলুম।' কবিপুত্র রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের একস্থানে কবির সাঁতারপটুতার কথা লিখেছেন। কবিকন্যা মীরাদেবীও 'স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন—'বাবা ভাল সাঁতার জানতেন। সাঁতরে নদী পার হতে পারতেন।'

বিদ্যাসাগরও সাঁতারে খুব পটু ছিলেন। মায়ের ডাকে তাঁর বর্ষার উদ্দাম দামোদর নদ সাঁতরে পার হওয়ার প্রচালিত গল্পের মধ্যেই তার কিছুটা প্রমাণ আছে। বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ শুধু সাঁতারেই দক্ষ ছিলেন না, তিনি নৌকায় দাঁড় টানতেও অদ্বিতীয় ছিলেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষও সাঁতার কাটতে ভীষণ ভালবাসতেন। তিনি কলেজ জীবনে নিয়মিত তিন চার ঘণ্টা সাঁতার কাটতেন। মাইকেল মধুসূদনও সাঁতারে পারদর্শী ছিলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হেদুয়া সুইমিং ক্লাবের সদস্য ছিলেন। সাঁতারু পোষাকে সত্যেন্দ্রনাথের ছবিও পাওয়া যায়। কথাশিল্পী বিভূতিভূষণও ভাল সাঁতার জানতেন। স্বামী অভেদানন্দও সাঁতারু হিসেবে দক্ষ ছিলেন।

কবি বিহারীলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা রজনীকান্ত সম্পর্কে যদি কেউ 'ললিত লবঙ্গলতা' কোন অবয়বের কথা কল্পনা করে থাকেন, তাহলে ভুল করবেন। কবির ভাষায় বলতে গেলে 'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয়গো।' শারীরিক দিক থেকে এঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত পটু ছিলেন।

বিহারীলাল সম্পর্কে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন—'বিহারী বাল্যকালে একটু দাঙ্গাবাজগোছ ছিলেন।' কথাটা কিছুটা সত্যি। বঙ্গসুন্দরী-সারদা-মঙ্গলের স্রষ্টাই একদিন লাথি মেরে একজন গোরা সৈন্যকে ধরাশায়ী করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও রীতিমত ব্যায়াম করতেন। তিনিও গড়ের মাঠে একবার কয়েকজন গোরা সৈন্যকে তাঁর শারীরিক বলের নমুনা দেখিয়েছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ পঁচাত্তর বছর বয়সেও মুগুর ভেঁজে যৌবনোচিত স্বাস্থ্য রক্ষা করেছিলেন।

এদিক থেকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। তিনি খুব ভালো জিমনাষ্টিক করতে পারতেন। একবার প্রথম হয়ে রাজশাহী কলেজে পুরস্কার পান। তাঁর ব্যায়াম দেখে মনে হত, তাঁর গলায় ও কোমরে বোধ হয় হাড় নেই। হাডু-ডু খেলতেও তাঁর জুড়ি ছিল না। পাবনা জেলায় প্রচলিত 'ট্যামবাড়ি' ও 'টুনকি বাড়ি' খেলাতেও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কান্তকবি সাঁতারেও খুব পটু ছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী খেলাধুলায় যেমন উৎসাহী ছিলেন, তেমনি তাঁর পারদর্শিতাও ছিল। তাঁর অগ্রজ সারদারঞ্জনকে লোকে মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ বলে যতটা চিনত, তার চেয়ে বেশি চিনত বাংলা ক্রিকেটের জনক হিসাবে। সাহেবরাও তাঁর ক্রিকেট খেলার দক্ষতা দেখে 'ডবলু জি গ্রেস অব ইণ্ডিয়া' বলত। অবশ্য গ্রেসের সঙ্গে তাঁর চেহারাতেও আশ্চর্য মিল ছিল। অনুজ কুলদারঞ্জনও ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত টেনিস ও ব্যাডমিণ্টনের একজন ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনও ভালো টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের সঙ্গে খেলোয়াড় যতীন্দ্রমোহনের অনেক স্মৃতি বিজড়িত। ধূর্জটিপ্রসাদ ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় টেনিস খেলতেন। ইডেন হোস্টেলে থাকাকালীন যদুনাথ সরকার ফুটবল খেলতেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র হাডু-ডু খেলতেন। রূপকার নন্দলাল বসু ছিলেন একজন ভালো ভলিবল খেলোয়াড়। শান্তিনিকেতনে আরো অনেক স্রষ্টাকে নানা প্রকার খেলাধুলা করতে দেখা যেত। কথাশিল্পী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও একজন সুদক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের প্রতিকৃতি দেখে যতই দুর্বল মনে হোক না কেন, যৌবনে তিনি অত্যন্ত বলশালী ছিলেন। তাঁর জীবনীকার অনাথ

-নাথ বসু একস্থানে লিখেছেন—'যৌবনে তিনি তাঁহার ক্ষীণ শরীরে অসাধারণ বলধারণা করিতেন। কুস্তী সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি কৌশল অবগত ছিলেন। সেই সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া তিনি মল্লযুদ্ধের সময় তাঁহার অপেক্ষা বলবান ও বৃহৎকায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিতেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ নির্দিষ্ট কোন ব্যায়াম না করলেও ভীষণ পদচারণা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখতে লিখতেও একবার পায়চারি করে নিতেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা করে বারান্দায় দ্রুত পায়চারি করতেন। ডাঃ নীলরতন সরকারও হাঁটাহাঁটিকেই শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম বলে মনে করতেন। তিনি বারো চোদ্দ মাইল পথ হাঁটতেও এতটুকু ক্লান্তিবোধ করতেন না।

বিখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ব্যায়ামপুষ্ট দেহ-সৌষ্ঠবের কথা সকলেরই প্রায় জানা। তাঁর এক গুণগ্রাহী হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর সম্পর্কে একস্থানে লিখেছেন—'দেবীপ্রসাদের মত বলিষ্ঠ পেশীবদ্ধ ও পুরুষোচিত চেহারা বাঙালি কবি ও শিল্পীদের মধ্যে আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন, অপরিচিত লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁকে পালোয়ান ছাড়া আর কিছু বলে মনে করতে পারত না।'

মনীষীদের জীবন সমন্বয়-সাধনার জীবন। কর্মের সঙ্গে জীবনের সমস্ত দিকের আনুপাতিক সমন্বয় না ঘটাতে পারলে যে পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ হয় না—এ তথ্যটি তাঁদের জীবনেই শুধু নয়, তাঁরাই জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন।

বাঙালি মনীষীর বিচিত্র নেশা

কিছু কিছু নেশাবিলাস প্রায় সকলেরই থাকে। পান, চা-পান, ধূমপান তো খুবই সুলভ, সুরাপানও ক্ষেত্রবিশেষে প্রচলিত। আমরা এ বিলাসকে যে চোখেই দেখি না কেন, মনীষীরা কিন্তু এ নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, স্তুতিগান এবং রসিকতা সবই করেছেন। তাঁদের কর্মবহুল জীবনে নেশা যে কি অপরিসীম প্রেরণা জুগিয়েছে, তাঁরা তা ভোলেন নি।

প্রথমে চা-পানের কথা ধরা যাক। বিশ্বসাহিত্যে চায়ের কি কম গুণগান আছে? সংস্কৃত কাব্যে বলা হয়েছে—'স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধ সারবৎ বিশ্বতো মুখম্।' বিশ্বসাহিত্যের জনসন-বালজাক-কাউপার যেমন চায়ের ভক্ত ছিলেন, তেমনি গুণগানও করেছেন পঞ্চমুখে। কাউপার বলেছেন—The Cups that cheereth but not inebriate !

বাঙালি মনীষীদের মধ্যে অনেকেই চায়ের ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে দীনেশচন্দ্র-প্যারীচরণ-দ্বিজেন্দ্রলাল-নজরুল সকলেই। অতিরিক্ত তন্দ্রাভাব কাটানোর জন্যে চা বা কফি পান শুরু করলেও প্যারীচরণ সরকার চা-কফিকে ভালবাসেন নি, এমন নয়। অনেকে হয়ত জানেন না আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যিনি সারাজীবন চা-পানের বিরোধিতা করেছেন তিনিই প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক মগ করে চা-পান করতেন। রসায়ন-রসিক প্রফুল্লচন্দ্র পরিহাস করে চায়ের নাম দিয়েছিলেন—Aqua Pura !

চা-পানের বিচিত্র পদ্ধতি ছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনি খানিকটা গরম জলে কয়েকটা চা-পাতা ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দুধ মিশিয়ে খেয়ে নিতেন। দীনেশচন্দ্র সেন চা-পান করতেন অত্যন্ত চিনি মিশিয়ে। কেউ প্রশ্ন করলে বলতেন, চিনি খাব বলেই তো চা খাই। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথও অত্যন্ত বেশি চা-পান করতেন।

চা-পানের পদ্ধতি স্বতন্ত্র হলেও রবীন্দ্রনাথ চায়ের ভক্ত ছিলেন আন্তরিক। ১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনে কবির চীন ভ্রমণকালের দোভাষী সু-সী-মো'র নামে চা-চক্রের প্রতিষ্ঠা হয় প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে। কবি এ উপলক্ষ্যে গান রচনা করেন—

চা-স্পৃহ চঞ্চল   চাতকদল

চলো চলো চলো হে।

টগবগ উচ্ছল   কথলীতল জল

কল কল হে ।।

পরবর্তীকালে এই চা-চক্রের আমন্ত্রণে আর একটি কবিতায় কবি অতিথি-গণের প্রতি লেখেন—

চা-রস ঘন শ্রাবণধারা প্লাবন লোভাতুর

কলাসদনে চাতক ছিল ওরা—

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন চায়ের দারুণ ভক্ত। চায়ের যশোগানে তিনি চা-কে অমর করে রেখেছেন—

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই

যশমান চাহি না।

(শুধু) বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই

ভালো এক পেয়ালা

চা-চা-চা-চা ।

অসার সংসারে কে কার বলো কার

দারা সুত বাপ মা

(এ) অসার জগতে যাহা কিছু সার

এক পেয়ালা চা-চা-চা-চা ।

ধূমপান করেও বাঙালি মনীষীরা কম আনন্দ উপভোগ করেন নি। বিশ্ব-সাহিত্যের অমর স্রষ্টা কার্লাইল, টেনিসন ও টলস্টয় ধূমপান করতেন ভীষণ-ভাবে। টলস্টয় পরবর্তীকালে এ অভ্যাস ছেড়ে দিলেও অন্য ধূমপায়ীর ধোঁয়া আস্বাদন করে কিছুটা তৃপ্তি পেতেন। আমাদের দেশে মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুর অত্যন্ত ধূমপান করতেন। তাঁর প্রিয় ভৃত্য হুলি তামাক সেজে দিত। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার সাহেব দ্বারকানাথের সঙ্গে একত্রে হুঁকা সেবন করতেন। পরবর্তীকালে সেকথা স্মরণ করে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলেছিলেন—Oh ! I have smoked many a Hookah with your grandfather in Paris !

বিদ্যাসাগরও তামাকসেবন করতে ভালবাসতেন। চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর হাতে হুঁকা দেখা যেত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তামাকুসেবনের তারিফ করে

একস্থানে মন্তব্য করে বলেছেন—'বুদ্ধির প্রদীপে ইনি উস্কিবার কাঠি।' পরবর্তীকালে তামাকের আর এক গুণমুগ্ধ ভক্ত রজনীকান্ত সেন বলেছেন—

বুদ্ধির গোড়ায় তোমার ধোঁয়া
না পৌঁছিলে
বেরোয়নাক মুসোবিদা কি
মুস্কিল এ!
Idiom না জাগে, ফাঁকা
ফাঁকা লাগে,
হেঁয়ালী problem এর
উদ্ধার শক্ত হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তামাকের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। মজফর নামে এক খানসামা তাঁর তামাক সাজত। এই মজফর একবার টাকা চুরি করে ধরা পড়তে দেশবন্ধু পরিহাস করে বলেছিলেন—এবার থাক। লোকটা বড় চমৎকার তামাক সাজে। তামাক সাজার জন্যেই মজফরকে দেশবন্ধুর নিত্য-সঙ্গী হতে হত।

শরৎচন্দ্র তাম্রকূটসেবনে অবিরাম ধূমোদ্গিরণ করতেন। ধূমোদ্গিরণের সময় তিনি মাঝে মাঝে একটি শ্লোক আওড়াতেন—

তাম্রকূটং মহাদ্রব্যং সমস্যায়
পিয়তে যদি
টানে টানে মহাফলং মা তা
দিয়া মহৎসুখম।

বাঙালিদের মধ্যে সর্বপ্রথম সিগারেট খান মাইকেল মধুসূদন। উত্তরপাড়ার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একস্থানে বলেছেন—'মাইকেলই বাঙালিদের মধ্যে সর্বপ্রথম সিগারেট ব্যবহার করেন।' অন্যান্যদের মধ্যে চেনস্মোকার ছিলেন প্রমথ চৌধুরী ও জলধর সেন। অবনীন্দ্রনাথও কম খেতেন না। হেমেন্দ্রকুমার রায় একস্থানে বলেছেন—'সিগারেট না হলে চোখে অন্ধকার দেখি।' অস্কার ওয়াইল্ডের ভাষায় তাঁর কাছে সিগারেট ছিল 'নিখুঁত আনন্দ'। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুও এক সময় চেনস্মোকার ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের আর একটি নেশা ছিল নস্যির। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নস্যির এত নেশা ছিল যে, শেষ বয়সে নস্যিতে তাঁর আর শানাত না। তিনি

মতিহারী পাতা গুঁড়ো করে নিতেন। ইংরেজি সাহিত্যের অমর স্রষ্টা জনসনেরও নস্যির নেশা ছিল। সুইফটও এত বেশি নস্যি নিতেন যে, সবসময় তাঁর জামাকাপড় নোংরা থাকত।

কোলরিজ ও ডিকুইন্সি আফিমের ভক্ত ছিলেন। ডিকুইন্সি আফিমসেবকের স্বীকারোক্তি নামে একটি গদ্যকাব্য রচনা করেন। প্রবাদ আছে যে কবি কোলরিজ এত আফিম খেতেন যে সব সময়েই অনর্গল বকতেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তাঁকে এড়িয়ে যেতেন। অবশ্য তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই এই অবস্থায় রচিত। বাঙালি মনীষীদের মধ্যে বিদ্যাসাগর আফিম সেবন করতেন। অবশ্য সেটা ডাক্তারের পরামর্শে। আফিম না খেলে শরৎচন্দ্রের লেখাই খুলত না। শরৎচন্দ্র নিজে একস্থানে বলেছেন—'এমন নেশা নেই, করিনি। এটাই দেখলাম শ্রেষ্ঠ।'

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় খেতেন সিদ্ধি। ছাত্রাবস্থায় তিনি যে কতটা সিদ্ধি খেতেন সেটি তিনি তাঁর 'আমার ভারত উদ্ধার' রচনায় লিখে গেছেন—'এত সিদ্ধি খাইতাম যে, কলেজেও নেশার ঝোঁক যাইত না।'

মদ্যপান বন্ধ করার জন্যে যে প্যারীচরণ সরকার হিতসাধক আন্দোলন শুরু করেন, তিনি শোনা যায় গঞ্জিকাসেবন করতেন। সেকালের বিখ্যাত কবিয়াল ধীরাজ তাই এ নিয়ে একটি গানও রচনা করেন—

মধু পান আর কোরো না
Young Bengal বাঁচবে না—
কিন্তু ড্যাঙ্গাপথে নাইকো মানা।

গঞ্জিকার আর এক গুণমুগ্ধ ভক্ত গিরিশচন্দ্র পরিহাসস্থলে গাঁজা-মহিমার একটি স্তোত্র বলতেন—

গাঁজা চ গঞ্জিকা গাঁজা ত্বরিতানন্দদায়িনী।
উচ্যতে প্রাকৃতে গেজা ইতি তে নাম পঞ্চকম্॥
সদ্যঃপাপোঘসংহন্ত্রী সদ্যশ্চিন্তাবিনাশিনী।
সুখদা ধ্যানদা গাঁজা গাঁজৈব পরমা গতিঃ॥
সংসারাসক্তচিত্তানাং সাধনাৎ গঞ্জিকা সদা।
দুশ্চিন্তাবিস্মৃতের্হেতুঃ ত্বং হি লক্ষ্মীবিরোধিনী॥

কাজী নজরুল ভক্ত ছিলেন তাম্বুলের। দিনে চল্লিশ পঞ্চাশটি পান না হলে তাঁর চলত না। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ সব সময়েই পান খেতেন।

'শিশিরকুমার কথাপ্রসঙ্গে কবি নবীনচন্দ্র একস্থানে লিখেছেন—'পানের অলক্তরাগে অধরপ্রান্তদ্বয় প্লাবিত।'

যে সুরাপানের নাম শুনে আমরা এখনও বিচলিত এবং সন্ত্রস্ত হই, সেই সুরাপান করে কিন্তু মনীষীরা কম আনন্দ উপভোগ করেন নি। রঙ্গরসিকতা করতেও ছাড়েন নি। জীবনে মনীষীরা এ অভ্যাসকে কখনো কলঙ্কজনক মনে করেন নি, কেউ গোপন করারও চেষ্টা করেন নি। বাইবেলে যে সুরা সম্পর্কে বলা হয়েছে wine which cheereth God and man এবং মহাকবি কীটস উচ্ছ্বাসে যে সুরা সম্পর্কে বলেছেন—O for a draught of vintage—ইংরেজি সাহিত্যে সেই সুরার ভক্ত কি কম! সেক্সপীয়র-এডিসন-বেনসন-জন-গোল্ডস্মিথ, ফিল্ডিং, শেরিডান, চার্লস ল্যাম্ব সকলেই সুরার কিছু না কিছু যশোগান করে গেছেন।

বাঙালি মনীষীদের মধ্যে রামমোহন থেকে শুরু করে ঈশ্বর গুপ্ত-দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, মধুসূদন. অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, শরৎচন্দ্র, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, স্যার রাসবিহারী ঘোষ পর্যন্ত অনেকেই সুরাপান করতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থে সুরাপান নিয়ে কটাক্ষ করলেও তিনি নিজেও গুরুদেব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুসরণে শুরু করেন। তাই গুপ্তকবি এ নিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েন নি—'মাথামুণ্ডু ঘুরে গেল মাথামুণ্ডু খেয়ে।'

গুপ্তকবি সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে লিখেছেন—'প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময় লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসব করিত।' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র পান না করলে জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লিখতে পারতেন না। স্যার রাসবিহারী ঘোষ সিংহলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে গিয়ে মদ্যপান নিষেধ শুনে ধর্মত্যাগের বাসনা পরিত্যাগ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্ছ্বসিতভাবে সুরাপানের জয়গান করেছেন। তাঁর হাসির গানে—

হৃদিরূপ এই বাক্স খুলিতে
সুরাই একটি চাবি রে।
বোতল খুলিলে খুলিবে হৃদয়
হৃদয় তা অবশ্যম্ভাবী রে।

আবার অন্যত্র একস্থানে বলেছেন—

বিপদ আছে সুরাপানে বলেই
তাতে এমন মজা
বিপদটাকে পেড়ে ফেলে
উড়ায়ে দি জয়ধ্বজা।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র নিজে স্বীকার করেছেন—'সব নেশার রাজা এই মদ্য' হয়তো সেজন্যই একদিন একাদিক্রমে বাইশ বোতল বিয়ার খেয়ে ফেলেছিলেন তিনি। সুরাপান সম্পর্কে তিনি এত উদার ছিলেন যে, শিষ্য অমৃতলালের সঙ্গে একত্রে পান করতেও তাঁর সঙ্কোচ হত না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাক্ষাতেও তিনি পান করতেন। গুরুশিষ্য একত্রে যে নটী বিনোদিনীর গৃহে সুরাপান করতেন, সেকথা শিষ্য অমৃতলাল তাঁর 'অমৃত মদিরায়' লিখে গেছেন—

আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার।
বিনীর বাড়িতে গিয়ে খেতাম বিয়ার॥

অন্যত্র অমৃতলাল আরও মজার কথা লিখেছেন—

প্রভাতে ধরেছি গ্লাস সন্ধ্যা হয়ে গেছে।
দ্বিযামা ত্রিযামা পুন উষা দেখা গেছে॥
ঘুরিয়াছে বসুমতী সেরে নিজ কাজ।
আমার স্মরণে গোল 'কাল' কিংবা আজ॥
উঠি উঠি বাধা পড়ে—'আর এক পাত্র'।
গুরু যদি বাড়ে ভাত পাত পাড়ে ছাত্র॥

বাংলাদেশে এই অভ্যাস বন্ধ করার জন্যে প্যারীচরণ সরকারের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তাঁর হিতসাধক পত্রে 'সুরা দেবীর প্রতি' নামে একবার একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, তাতে ভয়ঙ্কর ভাষায় লেখা হয়—

ঢালিয়া গলায়, পড়িয়া খানায়
শয়ন করিয়া থাকিব সুখে।
কুকুর রতন, চাটিয়া বদন
চরণ তুলিয়া '—' মুখে॥

কিন্তু স্রষ্টারা হয়তো এসব সমালোচনা আনন্দেই উপভোগ করেছেন। একমাত্র শিবনাথ শাস্ত্রী ছাড়া সম্ভবত আর কোন মনীষী প্রকাশ্যে অনুশোচনা

করেন নি। মধুসূদনের মত সকলেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আনন্দ উপভোগের বস্তুটির প্রশংসা করে গেছেন।

মনীষীজীবন এমনই বিচিত্র। জীবনে যেটাই অবলম্বন করেছেন, সেটাই তাঁদের প্রতিভাস্ফুরণের সহায়ক হয়েছে। কোনটাই কোন কাজে প্রতিবন্ধকতা করতে পারেনি। একজন রসিক নেশাকে দুরন্ত ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাশ ধরে রাখতে পারলে গতি দুর্বার হবে, কিন্তু না পারলে পতন এবং পরাজয়। মনীষীরা হয়তো এই কারণেই এসব থেকেও জীবনের সম্পদ, সাফল্য এবং গতি আহরণ করে নিয়েছেন। এখানেই তাঁরা সাধারণের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে!

হৈমবতী ও বাঙালি মনীষী

কলকাতা তথা বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের রাজাবাবু ওরফে রাজেন্দ্র দত্তকেই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলা হয়। সে সময়ে ডাঃ টনেরি প্রমুখ কয়েকজন ইউরোপীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এদেশে আসেন। রাজাবাবু এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে হোমিওপ্যাথির উন্নতি বিধানের জন্য প্রভূত চেষ্টা করেন। এরপর এগিয়ে আসেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. ডি পাশ করে যখন হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার বিরোধিতা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন রাজাবাবু তাঁকে এ বিষয়ে উৎকর্ষতার অনেক কাহিনী শোনান এবং এ বিদ্যায় তাঁকে আকৃষ্ট করেন। মহেন্দ্রলাল আস্তে আস্তে আগ্রহী হন এবং একরকম তাঁরই হাতে বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠা হয়।

সেকালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বাংলাদেশে এক প্রবল আন্দোলনের ঢেউ তোলে। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে—কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মতই মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষিত জনমানসে নবভাব সঞ্চারিত করে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই পরিহাসছলে হোমিওপ্যাথির এই গৌরবের কথা স্মরণ করে তার নতুন নামকরণ করেন 'হৈমবতী'। নামটি তাঁর স্নিগ্ধ কবি মনেরই পরিচায়ক। পরবর্তী কালে বাংলাদেশে এই হৈমবতী নিয়ে অনেক স্রষ্টাকেই ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। নামটি সেদিক থেকেও যথোপযুক্ত।

রাজাবাবু বিদ্যাসাগরকেও হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট করেন। সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারে সদা ব্যস্ত কর্মী বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা ব্যস্ততার মধ্যে এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জন্য মনোনিবেশ করেন। বহু টাকার বই কিনে তিনি অধ্যয়ণ শুরু করেন। শুধু তাই নয়, শবব্যবচ্ছেদ শিক্ষা ছাড়া চিকিৎসা-বিদ্যা অসম্পূর্ণ থাকে বলে তিনি ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষের কাছে শবব্যবচ্ছেদ শিক্ষাও করেন। তাঁর বাড়িতেও তিনি নরকঙ্কাল নিয়ে অবসরসময়ে

নাড়াচাড়া করতেন। বিদ্যাসাগরের সুচিকিৎসার একটি কাহিনী চিকিৎসক হিসেবে তাঁকে আজও স্মরণীয় করে রেখেছে। সে কাহিনীটি হল সাঁওতাল রমণীর কলেরা রোগের চিকিৎসা। বাস্তবিক পক্ষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ওপর বিদ্যাসাগরের আন্তরিক আগ্রহ ছিল। হোমিওপ্যাথির যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কেস হলে তিনি দেখতে যেতেন। কাশীর সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ লোকনাথ মৈত্র এবং কলকাতার ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীর ও বিহারীলাল ভাদুড়িকে হোমিওপ্যাথির পথে আগ্রহী করেন স্বয়ং বিদ্যাসাগরই।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যরচনা ছাড়াও যে-কটি বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন, তার মধ্যে জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিদ্যা উল্লেখনীয়। আলিপুরে থাকাকালীন তিনি মেডিক্যাল কলেজে শরীরতত্ত্ব পড়তে আসতেন।

জন্ম স্কটল্যাণ্ডে হলেও ডেভিড হেয়ার বাংলাদেশে থেকে আচার-ব্যবহার এবং আহারের দিক থেকে প্রায় বাঙালীই হয়ে গিয়েছিলেন। হেয়ার সাহেব একজন ভাল চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের যেমন অপরিসীম স্নেহে কাছে টানতেন, তেমনি তাদের অসুখবিসুখেও তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন।

কবি রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রতিভা চিকিৎসাশাস্ত্রকেও এড়িয়ে যায়নি। তিনি হোমিওপ্যাথিক এবং বাইওকেমিক—দু-ধরণের চিকিৎসাই করতেন। মংপুতে থাকাকালীন তিনি বহু রোগীকে ওষুধ দিতেন। শান্তিনিকেতনেও তাঁর চিকিৎসার সুনাম ছিল। তাঁর সংগ্রহে বহু মূল্যবান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার গ্রন্থ ছিল। মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি আছে, সেটি পাঠ করলে জানা যায়, কবিগুরুর এ বিদ্যার ওপর কত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলেছেন—'আমি যে ডাক্তার, ও তোমাদের ইউনিভারসিটির ডাক্তার নয়, চিকিৎসক। এক সময়ে সত্যিই অনেক বড় অসুখ সারিয়েছি। হোমিওপ্যাথি নিয়ে কম সময় দিইনি। ভাল ভাল হোমিওপ্যাথির বই ছিল আমার। তন্ন তন্ন করে পড়েছি।' শুধু তাই নয়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, কবি মাঝে মাঝে পরিহাসছলে বলতেন—'আমি কি নেই না বলে আমার প্রশংসা বা প্রচার হয়নি।'

মহাকবি গিরিশচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসামান্য খ্যাতিলাভ করেন। নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মানবসেবার মাধ্যম হিসাবে

হোমিওপ্যাথিই বেছে নেন। যথেষ্ট নিষ্ঠাসহকারে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও একটি নির্দিষ্ট সময়ে তিনি এ বিদ্যার চর্চা করতেন। এবং বহু দূর দূর অঞ্চলের রোগীদের চিকিৎসা করতেন। সে সময়ে সাধারণ মানুষের মনোভাবটি তিনি তাঁর 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' প্রহসনে ডাক্তার নন্দীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—'বদ্যি-হাকিম-হোমিওপ্যাথ. এরা রোগের কী জানে! প্যাথলজি পড়েছে?'

রসরাজ অমৃতলাল বসুও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বহু সময় ব্যয় করেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক লোকনাথ মৈত্রের সংস্পর্শে এসে এ বিষয়ে আগ্রহী হন। মেডিক্যাল কলেজে কিছুদিন ডাক্তারিশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও তাঁর আবাল্য আগ্রহ ছিল এ বিদ্যার ওপর। এ প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতিকথায় বলেছেন—'হোমিওপ্যাথির সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাল্যকাল হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এগার বৎসর বয়সের সময় আমাদের বাটীর সন্নিকটস্থ একটি বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যাওয়ায় আমার একটি হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। লোকনাথবাবু আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া দেখিলেন যে হাড় fracture হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমার বাবার অনুমতি লইয়া তিনি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেরিনিকে লইয়া আসেন। আমার ভাঙ্গা হাত লইয়া বোধ হয় কলিকাতায় হোমিওপ্যাথির প্রথম Surgical Case হয়। যে দিন প্রথম বন্ধনমোচন করিয়া একটা পাতলা bandage বাঁধিয়া দেওয়া হইল, সেদিন সেই ব্যাণ্ডেজখোলা দেখিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ডাক্তার রাজেন দত্ত আসিয়াছিলেন।'

এই লোকনাথ মৈত্রই কাশীতে ভারতবর্ষে প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার হাসপাতাল স্থাপন করেন। অমৃতলাল বসু গুরুপ্রশস্তিকায় লোকনাথ মৈত্র সম্পর্কে লিখেছেন—

মহাপ্রাণ লোকনাথ নিজে না পাতিয়া হাত
দীন দুঃখী তরে চায় চিকিৎসা-আলয়।
হ্যানিমান জয় জয় ভারতে কাশীতে হয়
হোমিওপ্যাথি হস্পিটাল প্রথমে উদয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার যেমন ভক্ত ছিলেন, তেমনি চিকিৎসাও করতেন ভাল। দার্জিলিং-এ থাকাকালীন তিনি একবার সহাধ্যায়ী বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলে

সকলকে অবাক করে দেন। অনেকেই তাঁর এ বিত্তার পারদর্শিতার কথা জানতেন না।

পাঁচালীকার দাশরথি রায় একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। তিনি কিছু কিছু ওষুধ তৈরি করতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর একটা জন্মগত ব্যুৎপত্তি ছিল। মনীষী রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষজীবনে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। প্যারীচরণ সরকারও একজন ভাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অল্পবিস্তর হাতযশ অর্জন করেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর চিকিৎসা না করলেও হোমিওপ্যাথির খুব ভক্ত ছিলেন।

মনীষীজীবন সত্যিই বিচিত্র এবং বিস্ময়ের। জ্ঞানবিজ্ঞানের নানাদিকের পথযাত্রী হয়েও তাই দেখা যায় তাঁরা এ শাস্ত্রটিও অধ্যয়ন করেছেন। আর প্রতিভার পরশপাথরের স্পর্শে সে শিক্ষাও তাঁদের সার্থক হয়েছে।

বাঙালি মনীষীর নাট্যাভিনয়

সংস্কৃতির একটি দিক যেমন অভিনয়, চিত্তবিনোদনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়ও তেমনি অভিনয়-দর্শন। তাই সাধারণ অসাধারণ সব ব্যক্তিই অভিনয় দেখে আনন্দ পান। বুদ্ধিজীবী অভিনয় দেখেন মানসিক চিন্তামুক্তির জন্যে, শ্রমজীবী দেখেন দেহমনের শ্রীবৃদ্ধিলাভের জন্যে।

বাঙালী মনীষীদের মধ্যে অনেকেই অভিনয় দেখতে ভালবাসতেন। বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, মধুসূদন, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সকলেই অভিনয় দেখে প্রভূত আনন্দ পেতেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখে বিচলিত দর্শক বিদ্যাসাগরের চটিজুতো ছুঁড়ে মারার প্রচলিত ঘটনা অভিনয় জগতে আজও একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও অভিনয় দেখতে ভালবাসতেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নামও এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। তিনি যেমন নাট্যাভিনয়ে আগ্রহী ছিলেন তেমনি নিজেও ছিলেন একজন সুঅভিনেতা। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত 'বেণীসংহার' নাটকে অভিনয় করে তিনি যশোলাভ করেন। ছাত্রজীবনে তাঁর হ্যামলেট নাটকে এবং পরবর্তী জীবনে নববৃন্দাবন নাটকে অভিনয় স্মরণীয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মঞ্চাধ্যক্ষ হিসেবে দক্ষ ছিলেন। মেট্রোপলিটন থিয়েটারে 'বিধবা বিবাহ' প্রভৃতি নাটক প্রধানতঃ তাঁরই তত্ত্বাবধানে অভিনীত হয়। ব্রাহ্মসমাজের আর এক ঋত্বিক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও একজন সুঅভিনেতা ছিলেন।

এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র অভিনয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়িতে থিয়েটারের জন্যে যে কমিটি গঠিত ছিল, বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদন তার কার্যকরী সদস্য ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার শুধু অভিনয় দেখেই আনন্দ লাভ করতেন না, নাট্যাভিনয়ে তাঁদের উদ্যোগও কম ছিল না। ১৮৭২ সালের ৩০ মার্চ চুঁচুড়ায় দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হয় প্রধানতঃ এঁদেরই উদ্যোগে।

বিনোদিনী দাসী 'আমার কথা'য় লিখেছেন—'একদিন বঙ্কিমবাবু তাঁহার মৃণালিনী অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় আমি 'মৃণালিনী'তে মনোরমার অংশ অভিনয় করিতেছিলাম। মনোরমার অংশ অভিনয় দর্শন করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন যে 'আমি মনোরমার চরিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখন যে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিব তাহা মনে ছিল না। আজ মনোরমাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যে আমার মনোরমাকে সামনে দেখিতেছি।'

মনীষীদের মধ্যে ভোলানাথ চন্দ, গৌরদাস বসাক, রমানাথ লাহা প্রভৃতিরা সুঅভিনয় করতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন একজন কুশলী অভিনেতা। বিখ্যাত চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর তাঁর ভ্রাতা রাধামাধব করের মতই সুঅভিনয় করতেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডবলিউ সি. বোনার্জী, ওরফে উমেশচন্দ্রের অভিনয়ে খুব আগ্রহ ছিল। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকাভিনয়ে তিনি শর্মিষ্ঠার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন। দর্শকরূপে উপস্থিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও উমেশচন্দ্রের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। 'রেইস এ্যাণ্ড রেইত' পত্রিকা-সম্পাদক সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও সুঅভিনয় করতেন।

নাট্যকারদের মধ্যে প্রায় সকলেই অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় হলেন গিরিশচন্দ্র এবং রসরাজ অমৃতলাল বসু। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছিলেন—'বিলেতে জন্মালে গিরিশবাবু স্যার উপাধি পেতেন'। গিরিশচন্দ্র অভিনয় করে যে সব চরিত্রগুলি অমর করে রেখেছেন, সেগুলি হ'ল—সধবার একাদশীতে 'নিমচাঁদ', লীলাবতীতে 'ললিতমোহন', কৃষ্ণকুমারীতে 'ভীমসিংহ', পলাশীর যুদ্ধে 'ক্লাইভ', পাণ্ডব গৌরবে 'কঞ্চুকী', নীলদর্পণে 'উডসাহেব', প্রফুল্লে 'যোগেশ', ম্যাকবেথে 'ম্যাকবেথ', বিষবৃক্ষে 'নগেন্দ্র', জনায় 'বিদূষক', সিরাজদ্দৌল্লায় 'করিম চাচা' এবং বিল্বমঙ্গলে 'সাধক'। সধবার একাদশীতে নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখে নাট্যকার দীনবন্ধু বলেছিলেন—'মনে হচ্ছে নিমচাঁদ যেন তোমারই জন্যে লেখা'। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে নিজের রাজবেশ ও তলোয়ার পরিয়ে দিয়েছিলেন। গিরিশ-শিষ্য রসরাজ অমৃতলাল বসুর

অভিনয়ে অমরচরিত্র হ'ল—'বিল্ব-মঙ্গলে' নামভূমিকা, 'নীলদর্পণে' সৈরিন্ধ্রি প্রভৃতি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবারবর্গের অনেকে অভিনয়ে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় বাংলা সংস্কৃতির আর একটি গৌরবময় অধ্যায়। সীতা দেবীর ভাষায় বলতে গেলে—'রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের আর কি বর্ণনা দিব! তাঁহার সবকিছুর তুলনা একমাত্র তাঁহাতেই মিলিত।......তিনি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন।' নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়িও একস্থানে বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথই দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।'

বিদ্বজ্জনসমাগমের প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত 'বাল্মীকি প্রতিভা'র প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই অভিনয় দেখতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষীগণ। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য অভিনয় দেখে সকলে আনন্দে অভিভূত হন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তার উত্তেজনায় তিনি একটি কবি-প্রশস্তি রচনা করে ফেলেন—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব বাল্মীকি প্রতিভা দেখাইতে পুনর্বার।

বিদ্বজ্জনসমাগমের উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'কালমৃগয়া' নাটিকারও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। এ নাটিকার প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নেমেছিলেন দশরথের ভূমিকায়। অন্যান্য ভূমিকাতেও ঠাকুর পরিবারের অনেকে অভিনয় করেন।

'রাজা ও রাণী' নাটকটি নতুন করে লিখে রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেন 'তপতী', তারপর কোলকাতায় মহাসমারোহে তার অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। সত্তর বছর বয়সেও কবি স্বয়ং রাজার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। সকলে বিস্ময় প্রকাশ করেন—কবি কেমন করে ওই বয়সে প্রেমের অভিনয় করবেন এবং তাঁর প্রলম্বিত শ্বেতশুভ্র দাড়িরই বা কি হবে! কিন্তু কার্যত কি হয়েছিল, সেটি একজন প্রত্যক্ষদর্শী কবি জসীমউদ্দীনের লেখায় সুস্পষ্ট—'অভিনয়ের সময় দেখা গেল, দাড়িতে কালো রং মাখাইয়া মুখের দুই পাশে

গালপাট্টা তুলিয়া দিয়া কবি এক তরুণ যুবকের বেশে মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন। 'তপতী' নাটকে ব্যর্থ প্রেমের সেই মর্মান্তিক হাহাকার কবির কণ্ঠমাধুর্যে আর আন্তরিক অভিনয় নৈপুণ্যে মঞ্চের উপর জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।'

রবীন্দ্রনাথ সত্যিই যে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন, সেকথা সর্বজনবিদিত। তাঁর অভিনয়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল—'রাজা' নাটকের 'ঠাকুর দাদা' 'নটীর পূজা' নাটকের 'ভিক্ষু-উপালী' 'বিসর্জন' নাটকের 'জয়সিংহ' 'ফাল্গুনী' নাটকের 'অন্ধ বাউল' 'অচলায়তন' নাটকের 'আচার্য অদীনপুণ্য' 'শারদোৎসব' নাটকের সন্ন্যাসী প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অনেক মনীষী অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ এবং বর্ণকুমারী, শরৎকুমারী, ইন্দিরা দেবী ও প্রতিভা দেবীও অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথও অভিনয় শিল্পে পারদর্শী ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুধু সুদর্শনই ছিলেন না, সু-অভিনেতাও ছিলেন। তাঁকে স্ত্রী-ভূমিকায় অনবদ্য মানাতো। নটীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে কেউ ধরতেই পারতো না যে, তিনি মহিলা নন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকায়ও তিনি অনবদ্য অভিনয় করেন।

১৮৭৭ সালে অনুষ্ঠিত 'এমন কর্ম করব না' (অলীকবাবু নাটকের পূর্বনাম) নাটকে 'সত্যসিন্ধু'র ভূমিকায় অভিনয় করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। অলীকবাবুর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং 'হেমাঙ্গিনী' ও 'পিসৃনি'র ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে শরৎকুমারী ও বর্ণকুমারী।

সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী এবং রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবীও অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮৯ সালে কোলকাতার সেণ্টপলস ক্যাথিড্রালে অনুষ্ঠিত 'রাজা ও রাণী' নাটকের অভিনয়ে পাত্র পাত্রী ছিলেন—বিক্রম—রবীন্দ্রনাথ, সুমিত্রা—জ্ঞানদানন্দিনী, দেবদত্ত—সত্যেন্দ্রনাথ, নারায়ণী—মৃণালিনী।

সেযুগে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে মৃণালিনী দেবীর অভিনয় করা নিয়ে যে প্রচণ্ড সমালোচনা হয়েছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবু তাঁরা অভিনয়কে এত ভালোবাসতেন যে, এসব সমালোচনা কোন আমলই দেন নি।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন, প্রতিমা দেবী তাঁর স্মৃতিচিত্র-এর একস্থানে অবনীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন—'কৌতুক নাট্যের পার্টে অবনীন্দ্রনাথের ক্ষমতা প্রকাশ পায়। শোনা যায় কবিগুরু 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় তিনকড়ি চরিত্রটি বিশেষ করে কথা মনে করে লিখেছিলেন। এই পার্টে তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন আজও তাঁদের স্মৃতিপটে সে ছবি উজ্জ্বল হয়ে আছে।' বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র একবার তাঁর তিনকড়ির পার্ট দেখে বলেছিলেন—'এরকম সব অ্যাক্টর যদি আমার হাতে পেতুম তবে আগুন ছুটিয়ে দিতে পারতুম।'

অবনীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্পর্কে আরও মন্তব্য আছে। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'যাত্রী' গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন—'ডাকঘর নাটিকায় অবনীন্দ্রনাথের বৈদ্য আর মোড়ল এই দুই চরিত্রের অভিনয় সে যে কী অপূর্ব, আশ্চর্য সৃষ্টি তা যে না দেখেছে তার পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। আমার মতে অভিনেতা হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বড়ো। যে অংশই গ্রহণ করুন না কেন রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থেকে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত সচেতন সত্তা বিলীন হতে পারত না যে-চরিত্র অভিনয় করতেন তার মধ্যে। অবনীন্দ্রনাথ আশ্চর্যভাবে সে চরিত্র বনে যেতে পারেন।'

ঠাকুরবাড়ীর সংস্পর্শে এসে কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীও অভিনয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর অভিনয়ে একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি অনেক কথা উপস্থিত মত বানিয়ে বলতে পারতেন। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকে তাঁর অভিনয় অনেকের প্রশংসা অর্জন করে।

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খুব বেশি অভিনয় না করলেও তিনি একজন সুঅভিনেতা ছিলেন। কোলকাতার সঙ্গীত সমাজে একবার তাঁর 'সীতা' নাটকের অভিনয় হয়, সেই অভিনয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। 'প্রতাপ সিংহ' নাটকে শক্তসিংহের ভূমিকাতেও তিনি অনবদ্য অভিনয় করেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনও অভিনয়ে খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে পাগলিনীর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে অভিনয় করেও তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেন।

বাংলা শিশুসাহিত্যের অমর স্রষ্টা সুকুমার রায়ও একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ননসেন্স ক্লাবে অভিনয় অনুষ্ঠান প্রায়ই

হত এবং সেসব অভিনয়ে তিনিই হতেন মুখ্য অভিনেতা। তাঁর অভিনয় দক্ষতা সম্পর্কে অনুজা পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন 'ননসেন্স ক্লাবের অভিনয় এমন চমৎকার হত, যারা নিজের চোখে দেখেছে তারাই জানে। মুখে বর্ণনা করে তার বিশেষত্ব ঠিক বোঝানো যায় না। বাঁধা স্টেজ নেই, সীন নেই, সাজসজ্জা ও মেক আপ বিশেষকিছুই নেই, শুধু কথার সুরে ভাবেভঙ্গীতে তাদের অভিনয়-বাহাদুরি ফুটত। দাদা নাটক লিখত, অভিনয় শেখাত, আর প্রধান পার্টটা সাধারণতঃ সে নিজেই নিত। প্রধান মানে সবচেয়ে বোকা আনাড়ির পার্ট হাঁদারামের অভিনয় করতে দাদার জুড়ি কেউ ছিল না।' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সুকুমার রায়ের অভিনয় প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রথম জীবনে অভিনয় করতেন। পরবর্তীকালে 'কৈশোর স্মৃতি'তে তিনি নিজেই লিখেছেন—'.........অভিনয় করেছি, অভিনয়ের জন্য সুখ্যাতিও পেয়েছি। নিজের রোগা চেহারার জন্য রঙ্গমঞ্চে নামতে আজ লজ্জা পাই, নইলে হয়তো রঙ্গমঞ্চে অন্ততঃ এখানকার সখের অভিনয়ে অভিনয় করতাম।'

শান্তিনিকেতনে অভিনয় পর্বের যে আয়োজন হত তাতে বাংলাদেশের বহু গুণী শিল্পী অভিনয় করতেন। এঁদের মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, অসিতকুমার হালদার, ক্ষিতিমোহন সেন, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৩২১ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে 'অচলায়তন' নাটকের যে অভিনয় হয় তাতে পিয়ার্সন সাহেব পর্যন্ত অভিনয় করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস স্টুডিওতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র যে অভিনয় হয়েছিল, তাতে অভিনেতাদের মধ্যে সজনীকান্ত দাস, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথমনাথ বিশী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিরা ছিলেন। বিপিনের ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথের অভিনয় অনবদ্য হয়েছিল। তাঁর বই বাজিয়ে 'ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা' গান করা অনেকদিন দর্শকদের মনে ছিল।

বর্তমানে আমাদের দেশে সৌখিন নাট্যাভিনয় বেশ প্রসার এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নাট্যাভিনয় সম্পর্কে গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। সেই সঙ্গে বাঙালি মনীষীদের নাট্যাভিনয় স্মরণ করলে তাঁদের যথোচিত সম্মান জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কল্যাণ হবে।

বাঙালি মনীষীর উদ্ভিদ চর্চা

শুধুমাত্র রুটিতে মানুষ বাঁচতে পারে না। দিনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্তির আশায় আমরা তাই নানা কিছুর আশ্রয় নিই। সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত-খেলাধূলা—এসব নেশার আশ্রয় বহুল পরিচিত হলেও চাষআবাদের নেশাও এর মধ্যে গণ্য। প্রকৃতির এত কাছাকাছি থাকার সুযোগ সম্ভবত আর কোনটিতে নেই। তাই বাঙালী স্রষ্টাদের মধ্যে অনেককে এই আনন্দে মেতে থাকতে দেখা গেছে। সৃষ্টির মধ্যে যে প্রাণবন্ত প্রকৃতির ছবি দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, সেই সাফল্যের মূলে হয়তো এই জলসিঞ্চনও একটি কারণ ছিল।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত রাশভারী এবং ক্রোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁর সাধের ফুলবাগানের পরিচর্যা করতেন, তখন তাঁর মেজাজ অত্যন্ত হাল্কা এবং সুমিষ্ট থাকত। তাঁর অর্জুনা দীঘির পাড়ে সাজানো ফুলবাগান চিত্রিত হয়েছে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের বারুণী পুষ্করণীর বর্ণনার মধ্যে। বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রেরও ফুলবাগানের শখ ছিল। কাঁটালপাড়ার বসত বাড়িতে তিনি একটি মনোরম পুষ্পোদ্যান রচনা করেছিলেন। 'পালামৌ' গ্রন্থে তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতি হয়ত এইভাবেই অঙ্কুরিত হয়েছিল।

এদিক থেকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বালিতে নির্মিত তাঁর উদ্যান যে কোন সংগ্রহশালাকে হার মানাতে পারত। তাঁর বিশাল উদ্যানে কত গাছই না ছিল। থুজা, সাইপেরস, পোথস, ক্রোটন, কোলিয়স, বিগোনিয়া, পেপোরোমা, কেলেথিয়া, এগলোনিয়া, এলো-কেলিয়া, অরেলিয়া, জেনেরিয়া প্রভৃতি বিশাল বৃক্ষ থেকে শুরু করে ব্রাউনিয়া জিনিয়া, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, চন্দন প্রভৃতি নানাজাতের সুশোভন বৃক্ষরাজিতে তাঁর উদ্যান পরিপূর্ণ ছিল।

এরকম উদ্যানশালার শখ ছিল প্যারীচরণ সরকারেরও। বারাসতে থাকাকালীন তিনি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণটি নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও সুরঞ্জিত পত্র শোভাময় তরুলতায় মনোরম করে তুলেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়েরও বাগানের খুব শখ ছিল। তাঁর এই বাগান তৈরীর আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম। কার্তিকেয়চন্দ্র এ প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবন চরিতে লিখেছেন :—'উপযুক্ত মালি ছিল না, নিজেই মালির কাজ করিতাম। বাগানী বা ভাণ্ডারী অথবা বেহারা কেবল আমায় সাহায্য করিত। আমি নিজ হস্তে পুষ্প বৃক্ষের শাখা ছাঁটিতাম, আম্রের কলস বাঁধিতাম এবং কখন কখন ফুলগাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতাম ও তাহাতে জলসেচ করিতাম। ......বৈকালে দুই তিন ঘণ্টা এই সকল কার্যে প্রবৃত্ত থাকিতাম। এরূপ শ্রমে আমার কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, যথেষ্ট আনন্দ হইত।'

রসরাজ অমৃতলাল বসুর গাছগাছড়ার শখও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। শালিখায় তিনি যে বাড়ীতে থাকতেন সেখানে সুন্দর একটি নার্শারী তৈরী করে নাম দেন : অমৃত নার্শারী। স্টার থিয়েটারের প্রাঙ্গণ এবং শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের সংলগ্ন উদ্যানও তাঁরই প্রচেষ্টায় মনোরম পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়। পরিণত বয়সে অমৃতলাল মেদিনীপুর জেলার গিধনীতে একটি বাগান তৈরী করেন। এই বাগানটিও নানা জাতের গাছপালায় সুশোভিত ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের ঋত্বিক শিবচন্দ্র দেবের ছিল ফলের বাগানের শখ। তাঁর সুযোগ্য জামাতা বিশিষ্ট সাংবাদিক 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষেরও গাছপালার ভীষণ শখ ছিল। তিনি নিজের হাতে কোদাল চালাতেন। অতুল প্রসাদের লক্ষ্ণৌ-এ নির্মিত বসত বাড়িটিও তাঁর গাছপালার শখের সাক্ষী হয়ে আছে। 'সদ্ভাবশতকের' অমর স্রষ্টা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারেরও ফল বাগানের ভীষণ শখ ছিল। পারস্যের অমর কবি সাদীর দুখানি কাব্য হল—গুলিস্তাঁ (গোলাপকুঞ্জ) ও বোস্তাঁ (বাগান)। কাব্য দুখানি কৃষ্ণচন্দ্রকে পাগল করেছিল। স্বাভাবিক কারণে তাঁর ফুলবাগান প্রীতিও ছিল আন্তরিক।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গাছপালার ওপর আগ্রহের কথা সর্বজনবিদিত। বুদ্ধদের নামের সঙ্গে যেমন অশ্বত্থ গাছ, রামকৃষ্ণের ছবি স্মরণ করলেই যেমন পঞ্চবটী বৃক্ষ কিংবা আমগাছের কথা মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের ছবি স্মরণ করলেও তেমনি ছাতিম বৃক্ষের কথা কেউ কেউ স্মরণ করবেন। চাষবাসের দিকেও তাঁর সুগভীর আগ্রহ ছিল। বিলেত থেকে কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রী নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন কুষ্টিয়ার হাকিম হয়ে বসেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আসেন। দুজনে সাক্ষাৎ হতে স্থির হয়ে আলুর চাষ করবেন। চাষের ফল আশানুরূপ না হলেও এদেশে আলু চাষের সেই প্রথম পদক্ষেপ।

কবিগুরুর কৃষিবিজ্ঞার অনেক নিদর্শন শান্তিনিকেতনে আজও বিদ্যমান। জেজেসচন্দ্র কিংবা জগদানন্দ তাঁকে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সহায়তা করেছেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথও কৃষিবিদ্যায় বিদেশী ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছিলেন।

টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের কৃষিবিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর উপন্যাসে নানা ধরণের গাছপালা ও ফুলবাগানের যে সুদীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় আছে। তাঁর 'কৃষিপাঠ্য' গ্রন্থ এই অভিজ্ঞতারই ফসল। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রেরও ফুলবাগানের শখ ছিল। আর ছিল অবনীন্দ্র ভ্রাতাদের। দেবানন্দপুরে যে বটতলায় বসে শরৎচন্দ্র গল্প করতেন, 'দত্তা' উপন্যাসে সেটাই হল ন্যাড়া বটতলা।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চাষআবাদের ঝোঁক ছিল আবাল্য। খুলনার বাড়িতে তিনি একটি নারিকেল বাগান করেন। ছুটিতে বাড়ি ফিরে তিনি হলুদের চাষ করতেন। শুধু তাই নয়, সেই হলুদ গুঁড়িয়ে হাটে বিক্রি করতে যেতেনও তিনি নিজে। বিজ্ঞান কলেজের সংলগ্ন বাগানেও তিনি কপি, বেগুন প্রভৃতি আনাজের চাষ করতেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি প্রেম তাঁর সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। আরণ্যক, হে অরণ্য কথা কও। অরণ্য মর্মর কিংবা 'পথের পাঁচালী'তে বর্ণিত জীবন্ত প্রকৃতি তাঁর সুগভীর আন্তরিকতা এবং অনুধাবন শক্তির সাক্ষ্য দেয়। নিশ্চিন্তপুরে তাঁর বসত বাড়ির বিখ্যাত বকুল গাছ স্থান পেয়েছ 'পথের পাঁচালী'তে। অপু-দুর্গা এরই নীচে খেলা করত। তেঁতুলতলার আমতলার কথা আছে 'তৃণাঙ্কুরে'। সলতেখাগী আমগাছের কথাও আছে 'পথের পাঁচালী'তে। তাঁর 'কনে দেখা' গল্পের একটি আমগাছের জন্য ব্যাকুল হিমাংশু যেন তাঁরই প্রতিচ্ছবি। লবটুলিয়া কিংবা ঘাটশিলায় নানাপ্রকার গাছের সঙ্গেও তাঁর আত্মিক যোগ ছিল।

জমি ছাড়াও যে উত্তম ফুলবাগান রচনা করা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাদের টবে তাই দেখিয়েছিলেন। তাঁর বাগান দেখে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী নতুন নামকরণ করেছিলেন: নন্দন কানন। ছাদের টবে ফুলবাগান রচনা করেছিলেন পরবর্তীকালে আরও দুজন স্রষ্টা—হেমেন্দ্রকুমার রায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

আজ সে অরণ্য নেই, আছে জন-অরণ্য। কিন্তু জীবনের কর্মধারা এবং সৃষ্টির পিছনে যে এ নিবিড়তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। বাঙালী মনীষীদের

জীবনই তার সাক্ষী। আজ নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা যে শিল্প সাহিত্য থেকে প্রকৃতিকে নির্বাসন দিয়েছে তার মূলেও হয়তো এই অনীহা! এই আগ্রাসী প্রাণহীনতা থেকে হয়তো একদিন সমস্বরে চিৎকার করে উঠবে—দাও ফিরে সে অরণ্য! শিল্প-সাহিত্যে আজ যা প্রায় অনুচ্চারিত।

বাঙালি মনীষীর সঙ্গীত সাধনা

গানবাজনার সমাদর এবং জনপ্রিয়তা চিরকালই আছে। দেবলোকে দেবতারা গানবাজনা উপভোগ করতেন, মর্ত্যলোকেও মানুষ প্রাচীন কাল থেকে গানবাজনার কদর করে আসছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যস্ত থেকেও তাই মনীষীরাও গানবাজনার সমাদর করেছেন। এদিক থেকে বাঙালি মনীষীদের গান বাজনার চর্চা একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে আগে নাম করতে হয় রামমোহন ও দ্বারকানাথের। রামমোহনের গানের গলা খুব ভাল না থাকলেও, তিনি সঙ্গীতের যে একজন প্রকৃত সমঝদার ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি তারই সাক্ষী। দ্বারকানাথ শুধু সমঝদার ছিলেন না, তিনি গাইতেও পারতেন। জার্মান দার্শনিক ম্যাক্সমূলার ইউরোপীয় সঙ্গীতে দ্বারকানাথের আশ্চর্য দক্ষতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। দ্বারকানাথ তাঁকে ইতালীয়ান, ফরাসী এবং ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত গেয়ে শোনাতেন। দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গীতে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ রচিত 'মিলে সবে ভারত-সন্তান' গানটিই ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত। এই গানটি হিন্দু-মেলায় প্রথম গীত হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

মধুসূদনের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর ছিল। হিন্দুকলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি পারস্য ভাষায় রচিত গজল গান গেয়ে সহপাঠীদের মুগ্ধ করতেন। তিনি একজন মৌলভীর কাছেও পারসী গজল শিখেছিলেন। ব্যারিস্টারী জীবনে মধুসূদন শুধুমাত্র দু-একটি ভাল গান শোনার বিনিময়ে অনেকের পক্ষে ওকালতি করেছেন। সঙ্গীতের ওপর অপরিসীম মমতাই এর কারণ। পরবর্তী জীবনে অবশ্য তাঁর কণ্ঠস্বর একেবারে ভেঙে যায়। কবিপত্নী হেনরিয়েটাও সুকণ্ঠি ছিলেন। তিনি পিয়ানো বাজাতেও দক্ষ ছিলেন। কন্যা শর্মিষ্ঠাও ভাল গান গাইতে পারতেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে 'অমৃত বেলোয়ার' নামে একটি রাগিনী সৃষ্টি করে গেছেন। ঋষি অরবিন্দ ও কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেরও। তিনি কীর্তন গান শুনতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর প্রথমাকন্যা অপর্ণা দেবী ও পুত্রবধূ সুজাতা দেবী সুগায়িকা ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেননি। নিজেও একজন ভাল গায়ক ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলতেন—রবি আমাদের বাংলা দেশের বুলবুল। তাঁর কণ্ঠ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—'গান গাইতেন বটে রবিকা! সে-গান তোমরা শোনোনি। কিন্তু আমি শুনেছি তাঁর গান, প্রাণমন একেবারে ডুবে যেতো তাঁর গানে গানে।'

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গান শুনে বনফুল রবীন্দ্রস্মৃতিতে লিখেছেন—'কিযে অপূর্ব মনে হয়েছিল তা লিখে বর্ণনা করা যাবে না। মনে হয়েছিল যেন একটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভ্রমর স্বরের অদ্ভুত মায়া-লোক, সৃজন করে গেল।' অনেকে হয়তো জানেন না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানটিতে সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

স্বামী বিবেকানন্দ ভজন ও ধ্রুপদ সঙ্গীত গাইতেন। তাঁর গুনমুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন পরমহংসদেব। সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আহারাদির ব্যাপারে অত্যন্ত সময়-সচেতন ছিলেন। তিনি জীবনে শুধু একবারই এই সময়সীমা লঙ্ঘন করেন, যেদিন তিনি তাঁর প্রাসাদে বসে মুগ্ধ হয়ে রজনীকান্তের কণ্ঠে গান শুনেছিলেন। কাজী নজরুলের উদাত্ত কণ্ঠের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র এবং পুত্র দিলীপকুমারেরও সুকণ্ঠ ছিল। দাদাঠাকুর ব্যঙ্গসঙ্গীতে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য নলিনীকান্ত সরকারও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান। প্রিয়ংবদা দেবীর কণ্ঠস্বর সুমধুর ছিল। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীও ভাল গান গাইতেন। আচার্য সুনীতিকুমার ছিলেন গানের একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতে যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তাঁর গান সংগ্রহের খাতা আজও বিদ্যমান। এ খাতার পাতায় পাতায় তিনি অনেক রচনার মক্স করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠ সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'শরতের সঙ্গীতের কণ্ঠস্বর ছিল সুরেলা, মিহি, সুমিষ্ট; কতকটা মেয়েলী ধরনের। গিটকিরি ও মিড়ের অলঙ্কারের দ্বারা তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সমৃদ্ধ।' সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের একটি গানের কথা স্মরণ

করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। তিনি লিখেছেন—'শরৎ ধীরে ধীরে একখানি এস্রাজ বাজাইয়া গাহিতে লাগিল : মথুরা বাসিনী মধুর হাসিনী।'

অতুলপ্রসাদ শুধু সঙ্গীত অনুরাগীই ছিলেন না, সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রাণ। ভাল গানবাজনা হলে তিনি বালকের মত অধীর হয়ে উঠতেন। ধূর্জটিপ্রসাদ প্রমুখ অন্তরঙ্গদের বলতেন—'বেসামাল হলে জামা ধরে টেনো।' তাঁর কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'নন্দলাল', যে নন্দলাল একদা করিল একটা ভীষণ পণ! দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও অতুলপ্রসাদের মুখে তাঁর হাসির গান শুনে বলেছিলেন—'আপনার মুখে আমার রচিত গান আরো সরস ও মিষ্ট শোনায়।'

কবিগুরুর 'সকল গানের ভাণ্ডারী, সকল সুরের কাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠ বাংলাদেশে কিম্বদন্তীর মত উচ্চারিত। রবীন্দ্রনাথ কোন একটি সুর রচনা করলেই দিনেন্দ্রনাথকে শিখিয়ে দিতেন, যাতে না সেটি হারিয়ে যায়। কবি নিজে বলতেন—'আমি গানগুলো তার ভাণ্ডারে জমা দিয়েই নিশ্চিত জানি দিনুর ভাণ্ডারে তা অক্ষয় হয়ে জমা থাকবে।' সৈয়দ মুজতবা আলী দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠ সম্পর্কে 'ময়ূরকণ্ঠী' গ্রন্থে লিখেছেন—'দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠ একজনকে শোনাবার জন্য নয়, এমনকি একটা সম্পূর্ণ আসরকেও শোনাবার জন্য নয়। তাঁর কণ্ঠ যেন ভগবান বিশেষ করে নির্মাণ করেছিলেন সমস্ত দেশের জনগণকে শোনাবার জন্য। তাই বোধহয় তাঁর কণ্ঠে যেরকম 'জনগনমন অধিনায়ক' গান শুনেছি আজ পর্যন্ত কারো কণ্ঠে সেরকম ধারা শুনলুম না। এরকম গলা এদেশে হয় না—এ গলার ভলুম পেলে ইতালির শ্রেষ্ঠতম অপেরা-গাইয়ে জীবন ধন্য মনে করেন।'

অজস্র সঙ্গীতের রচয়িতা হেমেন্দ্রকুমার নিজেও ভাল গাইতে পারতেন। আচার্য যদুনাথ সরকারেরও সুকণ্ঠ ছিল। তিনি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যেয় তাঁর প্রিয় তিনখানি গান গুনগুন করে গাইতেন। গান তিনখানি হল—'তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে', 'সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে' এবং 'তোমারেই করেছি করেছি জীবনের ধ্রুবতারা'। 'মহিলা' কাব্যের অমর কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় নির্ভুল সুরে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন।

কণ্ঠসঙ্গীতের মত যন্ত্রসঙ্গীতেও বাঙালি মনীষীদের মধ্যে অনেকেই কৃতিত্ব অর্জন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো ও বেহালা দুটি বাদ্যযন্ত্রেই পারদর্শী

ছিলেন। তিনি বেহালা বাজালে তবলাসঙ্গত করতেন 'উদাসিনী'র কবি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-খ্যাত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। কেশবচন্দ্র সেন ভাল বেহালা বাজাতেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ভাল এস্রাজ বাজাতেন। অনেক নাট্যানুষ্ঠানেও তিনি নেপথ্যে এস্রাজ বাজিয়েছেন। অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ শুধু ভাল পিয়ানোই বাজাতেন না, গানও গাইতেন।

কবি জগদিন্দ্রনাথ রায় ভাল পাখোয়াজ বাজাতেন। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুও ভাল পাখোয়াজ বাদক ছিলেন। তিনি এস্রাজ বাজাতেও দক্ষ ছিলেন। যেমন আইনস্টাইন বাজাতেন বেহালা। স্বামী অভেদানন্দ পাখোয়াজ বাজাতেন। বিবেকানন্দ গান গাইলে তবলা সঙ্গতও করতেন অভেদানন্দ। এছাড়া কীর্তনের সময় তিনি খোল বাজাতেন। কবি নবীন-চন্দ্র সেন বাঁশি বাজাতেন। পটুয়াটোলায় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি বাঁশি শিখেছিলেন। বিপ্লবী উল্লাসকর বাঁশির সুরে সকলকে মোহিত করে তুলতেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী পিয়ানো ও বেহালা দুটি যন্ত্রেই অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞরাও তাঁর পিয়ানো বাজানোর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তেজেসচন্দ্র সেনও ভাল বেহালা-বাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন শেষ বয়সে বিদেশী বাদ্যযন্ত্র বর্জন করেছিলেন তখনও শুধু তেজেসচন্দ্রকেই বেহালা বাজাতে দেখা যেত। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এস্রাজ ও বাঁশি বাজাতে পারতেন। আর ভাল বাঁশি বাজাতেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মনীষী জীবন অনেকটা পরশ পাথরের মত। তাঁরা যা কিছু স্পর্শ করেন, তাই তাঁদের স্পর্শে সোনা হয়ে ওঠে!

প্রেততত্ত্ব ও বাঙালি মনীষী

মনীষীদের কর্মজীবন বহুধা-বিভক্ত। জীবনের ভাণ্ডার থেকে জীবনরসের কোন উপাদানেরই তাঁরা আস্বাদ নিতে বাকি রাখেননি। আর তাঁদের আশ্চর্য প্রতিভাবলে সর্বক্ষেত্রেই তাঁরা লাভ করেছেন অনায়াস সিদ্ধি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে দিকই তাঁরা পরখ করেছেন, সেদিকের শিক্ষা কোন সময়েই অসম্পূর্ণ রাখেননি। তাই দেখা যায়, যে মনীষী শখ করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেছেন—তাঁরই শিক্ষা শেষ হয়েছে একজন সুচিকিৎসকের সিদ্ধিলাভে। যে শিল্পী বাগান করেছেন নিছক সময় কাটানোর জন্যে, তাঁরই সমাপ্তি ঘটেছে একটি আদর্শ ও সম্পূর্ণ উদ্যানে।

জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য দিকের ন্যায় অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন দিকেও বাঙালি মনীষীদের মধ্যে অনেকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ দিকটিও তাঁদের চর্চায় সমৃদ্ধ ও ধন্য হয়েছিল। বিশেষ করে প্রেততত্ত্ব (Spiritualism)।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষবিদ্যায় খুব আগ্রহী ছিলেন। তিনি কলকাতার তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতিষী ক্ষেত্রমোহনের কাছে দীর্ঘদিন জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। পরে আরব দেশীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্যে তিনি মৌলবী রেখে আরবি ভাষা পর্যন্ত শিখেছিলেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী লিখতে গিয়ে সাহিত্যসম্রাট যা মন্তব্য করেছিলেন, সেটিও অনুধাবন যোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'যাহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যক যে, তাঁর জন্মকালে তিনটি গ্রহ অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, রাহু তুঙ্গী এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে লগ্নাধিপতি ও দশমাধিপতি অস্তমিত। দেখিবেন ফল মিলিয়াছে কিনা।'

মাইকেল মধুসূদন এ বিষয়ে কোন সিদ্ধিলাভ না করলেও তিনি এ বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিলেন। প্যারিসের সিয়েনেতে থাকাকালীন এক ফরাসী মহিলার কাছে সম্মোহন বিদ্যার পরিচয় পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে তাঁর মায়ের নাম জিজ্ঞেস করেন। ফরাসী মহিলাটি নিঃসঙ্কোচে জবাব দেন—জাহ্নবী দেবী।

পারস্য ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথও একবার হাফেজের কবর দেখতে

গিয়েছিলেন। সেখানকার সংস্কার অনুযায়ী গভর্নর কবিগুরুকে জানান যে হাফেজকে মনে মনে প্রশ্ন করলে একটি গ্রন্থের মধ্যে তার সদুত্তর পাওয়া যায়। কবিগুরু প্রশ্ন করেছিলেন ভারতবর্ষের ধর্ম বিরোধের বিষয়ে। উত্তর এসেছিল —'দ্বার খুলিতেছে।' এছাড়া প্ল্যানচেটের দিকেও রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উক্তি বনফুলের 'রবীন্দ্রস্মৃতি'তে আছে। উক্তিটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমার মনে হয় মৃত্যুর পর সব শেষ হয়ে যায় না। আমরা ছেলেবেলায় প্ল্যানচেট করতাম। স্পিরিট এলে প্ল্যানচেট লেখা হয়ে যেত পেন্সিল দিয়ে। একবার আমরা আমাদের এক বৌঠানের স্পিরিটকে আনিয়েছিলাম। তিনি খুব ভাল-বাসতেন আমাকে। প্ল্যানচেটে প্রথম যে কথাটা বেরুল তাতে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। লেখা হল—খোকন, তুমি কী যে কর! আমি কোনও দুষ্টুমি করলে বৌঠান ঠিক ওই ভাষাতেই বকতো আমাকে।'

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর অমর স্রষ্টা প্যারীচাঁদ মিত্র প্রেততত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন পত্নী বিয়োগের পর থেকে। তাঁর পত্নী বামাকালী দেবী ছিলেন খড়দহের বিখ্যাত তান্ত্রিক প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যা। পত্নী বিয়োগের পর প্যারীচাঁদ এ বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেন।

প্যারীচাঁদের উৎসাহেই ভারতবর্ষে থিয়সফিস্ট সভার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮২ সালের ১৭ই এপ্রিল। প্যারীচাঁদ আমরণ তার সভাপতি ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশের Banner of Light, Spiritualist প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় তিনি প্রবন্ধাদি লিখতেন। প্রেততত্ত্বের ওপর তাঁর যেসব ইংরেজি রচনা আছে তার মধ্যে Spiritual Stray Zeaves, Stray Thoughts on Spiritualism এবং On the soul : its nature and Development উল্লেখযোগ্য। বাংলায় তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ হল 'অধ্যাত্ম বিজ্ঞান'। এসব ছাড়াও তাঁর 'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী' ও 'আধ্যাত্মিকা' তিনখানি উপন্যাসই এই তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৮১ সালে যখন কর্ণেল অলকট ও মাদাম ব্লাভাটস্কি এদেশে আসেন তখন প্যারীচাঁদই তাঁদের এ বিষয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। প্যারীচাঁদের সংস্পর্শে এসে তাঁর দুই পরমবন্ধু দিগম্বর মিত্র ও শিবচন্দ্র দেবও এ বিষয়ে মনোযোগী হন। শেষজীবনে প্যারীচাঁদ যোগ সাধণাও শুরু করেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ প্রেততত্ত্বে আকৃষ্ট হন সহোদর হীরালালের

মৃত্যুর পর থেকে। তিনি এবিষয়ে বহু পড়াশোনা করেন। ১৯০৬ সালে তিনি Hindu Spiritual Magazine নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। শিশিরকুমারের উৎসাহেই এবিষয়ে একটি আলোচনাচক্র গড়ে ওঠে। এই চক্রের উৎসাহী সভ্য ছিলেন—আনন্দমোহন বসু, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ মনীষীরা।

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্ল্যানচেট বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি Phrenology বা মস্তিষ্কবিদ্যাতেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে তাঁর কাছে প্রতিদিন বহুলোক আসত মাথা দেখাতে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু সময় ধরে মাথা পরীক্ষা করে তাঁদের শুভাশুভ নির্ণয় করতেন। স্যার আশুতোষের বিরাটাকৃতি মাথা দেখে তিনি একবার বলেছিলেন—'সব মাথাই আয়ত্ত করেছি। এই একটা বাদ পড়ে গেল।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখে অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ পরিহাস করে লেখেন—

মাথার তত্ত্ব খুঁজি পুঁথি করেন পুঁজি,
মাথা পেলে আর কিছু চান না।

মস্তিষ্কবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন আর একজন বাঙালি মনীষী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি কিশোরীচাঁদ মিত্রের দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেলে জামাতাকে তিরস্কার করে বলেন—'তুমি আমাকে আগে সংবাদ দিলে মাথার ছাঁচটা নিয়ে রাখতাম।'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মাঝে মাঝে প্ল্যানচেট ধরতেন। একদিন এমনি এক প্ল্যানচেটে ব্রহ্মবান্ধবের আত্মা এসে কাগজে লেখেন: You must defend Aurobindo!

জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল শ্রীঅরবিন্দের। মানব জীবনের উপর গ্রহনক্ষত্রাদির প্রভাব সম্পর্কে তিনি অটল বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্ল্যানচেটও করতেন। কথিত আছে তাঁর Yoga and its objects গ্রন্থটি ওঁর লেখা নয়। তিনি কলম ধরে থাকতেন আর এক অদৃশ্য শক্তি এসে লিখে যেত। রামমোহনের নামে এই গ্রন্থটি পাওয়া গেছল। তিনি যখন আলিপুর জেলে বোমা মামলার আসামী, তখন বিবেকানন্দ সূক্ষ্ম শরীরে এসে তাঁকে যোগ শিখিয়ে যেতেন। অরবিন্দ লিখেছেন—It is a fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me for a

fortnight in the jail in my solitary meditation and felt his presence.

অরবিন্দের সঙ্গে সঙ্গে বারীন্দ্রকুমারও প্ল্যানচেট শুরু করেন। তিনিও খুব ভাল 'মিডিয়াম' ছিলেন। অরবিন্দ অনুজের এই এই গুণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—Barin had done some very extra ordinary automatic writing at Baroda in a very brilliant and beautiful English style and remarkable for certain predictions which come true and statements of facts which also proved to be true. দুভাই মিলে একদিন বাবার আত্মা নামাল। আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা নামালে তিনি মন্দির গড়তে বলেন—'ভবানী মন্দির'।

অধ্যাত্মজগতের অন্যান্য মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্রের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরনীয়। নবকৃষ্ণ ঘোষ 'রামশর্মা' ছদ্মনামে বহু রচনা লিখেছেন অধ্যাত্মবাদের ওপর। দীনেশচন্দ্র সেন ভাল জ্যোতিষী ছিলেন, তিনি কোষ্ঠী রচনাও করতেন। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেততত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। তাঁর 'দেবযান' উপন্যাস এই অভিজ্ঞতারই দলিল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, তিনিও ঠিকুজি-কোষ্ঠী রচনা করতেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জ্যোতিষশাস্ত্রে আগ্রহী ছিলেন। তিনি বহু রাশিচক্র সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর এই বিষয়ের জ্ঞান পরিস্ফুটিত হয়ে আছে তাঁর সুবিখ্যাত 'জ্যোতির্মণ্ডল' কবিতায়। 'ফলিত জ্যোতিষ' নামক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠী বিচার করে প্রিয়নাথ সেনও তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তির পরিচয় দেন।

বাঙালি মনীষীর ব্যবসা-বাণিজ্য

লক্ষ্মী ও সরস্বতীতে যে কোন বিরোধ নেই এবং বিদ্যা ও অর্থ দুই-ই যে সমানভাবে একজন ব্যক্তির পক্ষে অর্জন করা সম্ভব—বাঙালি মনীষীদের জীবনই তার জ্বলন্ত সাক্ষী। তাই দেখা যায় ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেও তাঁদের অনেকের পদচারণা হয়েছে এবং এদিকেও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সিদ্ধিলাভ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখনীয় মনীষী হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। উইলিয়ম কার নামে একজন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে আধাআধি ভাগের ভিত্তিতে তিনি কার-টেগোর কোম্পানী খোলেন। প্রথমে এতে দশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। বিদেশী আদর্শে বাঙালীর সেই প্রথম কারবার। প্রতিদিন এই ব্যবসায় প্রায় আধ থেকে এক লাখ টাকার লেনদেন হত। ব্যবসায়ের বস্তু ছিল—চা, মদ, চিনি, সোরা, কয়লা এবং হুগলী, পাবনা রাজসাহী প্রভৃতি সাত-আটটি জেলার জমিদারী। আসাম থেকে কলকাতায় প্রথম চা আমদানী, কয়লাখনি এবং ডকিং ব্যবসা—সব তাঁরই হাতে প্রথম শুরু হয়। এই সাফল্যের পর দ্বারকানাথ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট প্রতিষ্ঠা করেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। তিনি এ ব্যাঙ্কের একজন অংশীদার ছিলেন। ব্যাঙ্কের ষোল লক্ষ টাকা মূলধন মাত্র দশ বছরে এক কোটি টাকায় পৌছায়। এছাড়া পেনিন্সুলার এণ্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পানীরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দ্বারকানাথ 'বেঙ্গল হরকরা' নামে সেকালের বিখ্যাত সাময়িক পত্রটিরও একজন সত্বাধিকারী ছিলেন।

দ্বারকানাথের এই উদ্যোগ পুত্রদের মধ্যে খুব বেশী সঞ্চারিত না হলেও, পৌত্রদের মধ্যে হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিলামে একটি জাহাজের খোল কেনেন সাত হাজার টাকায়। তারপর সেটি মেরামত করে নাম দেন 'সরোজিনী'। লেনদেনের কারবারে সরোজিনী অবশ্য খুব বেশী সফল হয়নি। এরপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাট ইত্যাদির কারবারে নেমেছিলেন, কিন্তু সেখানেও অসফল।

রবীন্দ্রনাথকে ব্যবসায় নামিয়েছিল তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্র

নাথ। তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন টেগোর এণ্ড কোম্পানী। এই ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য ছিল চাষীদের কাছ থেকে ধান ও পাট কিনে তা বাজারে ছাড়া। কিন্তু ব্যবসা জমেনি। কবির প্রায় সত্তর হাজার টাকার মত লোকসান হয়েছিল। এর পরে কবি পাতসরে খোলেন কৃষিব্যাঙ্ক। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় এবং চলে প্রায় কুড়ি বছরের মত। নোবেল পুরস্কারের প্রাপ্ত টাকাও কবি এই ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন।

দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের বৈষয়িক বুদ্ধি একেবারেই ছিল না। তবু দেবেন্দ্র নাথ একবার তাঁকে খাজনা আদায় করতে পাঠান গ্রামাঞ্চলে। সে বছর ফসল হয়েছিল অত্যন্ত বেশী। দেবেন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষে কাজটা সম্ভব হবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ জমিদারীতে গিয়েই কিন্তু চাষীদের দুর্দশা দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি বাবার কাছে খয়রাতির জন্য টাকা চেয়ে পাঠান। দেবেন্দ্রনাথের কাছে টেলিগ্রাম আসে : 'সেণ্ড ফিফটি থাউজেণ্ড'। নিরুপায় হয়ে তিনিও তাই জবাব পাঠান : 'কাম ব্যাক'।

বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ ব্যবসায় অত্যন্ত সাফল্য লাভ করেন। তিনি দ্বারকানাথের মত ইউরোপীয় বণিকের সঙ্গে 'কেলসাল ও ঘোষ' নামে একটি ফার্ম খোলেন। তারপর তিনি নিজেই শুরু করেন জি ঘোষ এণ্ড কোং। রেঙ্গুন ও আকিয়াবে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা অফিস ছিল। এই ব্যবসায়ে রাম-গোপাল প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর দানের কথা সর্বজন বিদিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি বহু অর্থ দান করেন।

আনন্দমোহন বসু বাঙালি জাতির দারিদ্র্য দূর করার জন্যে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই হলেন বাঙালি পরিচালিত প্রথম ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। আনন্দমোহন আসামের তেজপুরে একটি চা বাগানও স্থাপন করেন।

বিদ্যাসাগর পুস্তক ব্যবসা শুরু করেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটারি নামে দুটি প্রেস স্থাপন করেন এবং ছাপা ও প্রকাশনার কাজ একসঙ্গে করতে থাকেন। ঐ সময় তাঁর মাসিক আয় ছিল চার হাজার টাকার ওপর। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির ছিল দুধের ব্যবসা। তিনিও প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এই ব্যবসায়। তাঁর বিশালায়তন 'বাচস্পতি অভিধান' ছাপাতে সেকালে এক লাখ টাকার কাছাকাছি খরচ হয়েছিল। তারানাথ নিজেই এই ব্যয়ভার বহন করেন।

ডাঃ নীলরতন সরকারেরও ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব আগ্রহ ছিল। তিনি

স্থাপন করেছিলেন ন্যাশন্যাল সোপ ফ্যাক্টরী। প্রমথনাথ রায়চৌধুরীরও সাবানের ব্যবসা ছিল। ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরী তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। স্যার রাসবিহারী ঘোষ নেমেছিলেন পেন্সিলের কারবারে। তাঁর দেশলাই এবং ক্রোম চামড়ারও কারখানা ছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শিক্ষকতা ছেড়ে কৈলাসচন্দ্র বসু ব্যবসায় নেমে পড়েন। তিনি ম্যাকেঞ্জী লায়াল কোম্পানীর এজেন্সী গ্রহণ করেন। এ ব্যবসা তাঁর ভালই চলেছিল।

টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র ব্যবসায়ের প্রেরণা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁদের কাগজের কারবার ছিল। প্যারীচাঁদ কালাচাঁদ সেঠ এণ্ড কোম্পানীর অংশীদার হয়ে তাঁর ব্যবসায়ী জীবন শুরু করেন। এরপর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড সন্স নামে আমদানি-রপ্তানির নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেন। এই ব্যবসায় প্যারীচাঁদ প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

ব্যবসা-বানিজ্যে বাঙালিকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছেন যিনি, সেই প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আবাল্য আগ্রহ ছিল এই দিকে। প্রথম জীবনে তিনি চাষবাস করতেন, অনেকসময় তা থেকে আনাজপত্র হাটে বিক্রিও করতেন। তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি হল বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র আটশ টাকা মূলধন নিয়ে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন।

এসব ছাড়া ছোটখাট ব্যবসাও অনেক মনীষী করেছিলেন। বার্মায় থাকতে শরৎচন্দ্র কিছুদিন চায়ের দোকান চালিয়েছিলেন। বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমারেরও চায়ের দোকান ছিল।

মনীষী জীবন এমনই বিচিত্র। জীবনের যে পথে গেছেন, সে পথেই তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন। কোন কাজেই তাঁদের মূল লক্ষ্যে পৌছতে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। এখানেই তাঁদের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য!

বাঙালি মনীষীর সভা-সমিতি

মানুষের আড্ডা দেওয়ার প্রবৃত্তি চিরন্তন এবং সবসময়েই তা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। তাই সাধারণ মানুষ তো বটেই, পৃথিবীর সব দেশে মনীষীরাও নানাপ্রকার সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা করে সময় কাটিয়েছেন।

বাঙালি মনীষীদেরও অনেক সভাসমিতি ছিল। উপলক্ষ যাই থাক, লক্ষ্য যাই স্থির করা হোক—স্রোত কিন্তু মূলতঃ একইদিকে প্রবাহিত ছিল। সেটি মিলন এবং উপভোগের দিক। রামমোহনকে যদি আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির আদি ঋত্বিক বলে স্মরণ করা হয়, তাহলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'ই হল বাঙালি মনীষী প্রতিষ্ঠিত প্রথম সভা। ১৮১৫ সালে রামমোহন এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার অনুষ্ঠানে বেদান্ত ধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার নির্ণীত হত। উপস্থিত থাকতেন শহরের বড় বড় ব্যক্তি এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ। রামমোহনের বেদান্ত দর্শন, বেদান্তসার, উপনিষদের অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই সভারই আলোচনার ফসল।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর যে সভা প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম দেন 'জমিদার সভা'। এই সভা পরে জর্জ টমসনের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এ রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে এ সভার সভাপতি হন রাধাকান্ত দেব। উৎসাহী সভ্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সত্যশরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ মনীষীরা।

নিছক সাহিত্য আলোচনার জন্যে 'হুতোম প্যাঁচা' ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৫৩ সালের ১৪ই জুন। এই সভাতেই মধুসূদনকে তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য রচনার জন্যে একটি রৌপ্য নির্মিত মূল্যবান পানপাত্র এবং একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। বাঙালি কবির সেই প্রথম সামাজিক সম্মানলাভ। ১৮৫৭ সালের ৯ই এপ্রিল এই সভার উদ্যোগে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক যুগে এই সভার প্রভাব এবং অবদান ছিল যথেষ্ট।

'ইয়ংবেঙ্গলে'র কয়েকজন শরিক প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতিরা মিলে একটি সভা স্থাপন করে নাম দেন 'সাধারণ জ্ঞানার্জন সভা।' পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য তার নামকরণের মধ্যেই নিহিত আছে।

জর্জ টমসনের এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালির রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়। এই রাজনীতি শিক্ষাদানের জন্যেই তাই ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারত সভা'। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীরা ছিলেন ভারত সভার প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য। এই ভারত সভার প্রতিষ্ঠা দিবসেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের একটি পুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু তবু সুরেন্দ্রনাথ সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ইয়ং বেঙ্গলের কার্যকলাপ, দেশীয় রীতি-নীতির ওপর বিরূপ মনোভাব প্রভৃতি বন্ধ করার জন্যেও কয়েকটি সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। দেশীয় লোকেদের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করাই ছিল এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। পরবর্তী কালে নবগোপাল মিত্র যে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা করেন, তার উন্মেষ হয় প্রধানত এই সভারই প্রস্তাবনা থেকে প্যারী-চরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত 'সুরাপান নিবারণী সভা'ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সভার সভ্য ছিলেন—বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

ইংলণ্ড থেকে ফিরে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করেন 'ভারত সংস্কার সভা।' সাহিত্য প্রচার, সুরাপান নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি ছিল এই সভার মুখ্য কর্ম পদ্ধতির অন্তর্গত।

ঠাকুরবাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সুধীজনের যে সভা প্রতিষ্ঠা করেন সেই বিদ্বজ্জন সমাগমের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বিদ্বজ্জন সমাগমের প্রতিষ্ঠা হল ১৮ই এপ্রিল ১৮৭৪। এই সমাগমের বিভিন্ন অধিবেশনে নাটক অভিনীত হত। এমনি একটি অনুষ্ঠানে বাল্মীকি-প্রতিভা নাট্যাভিনয় দেখতে এসেছিলেন—সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই নাটকের কাব্যগুণ এবং অভিনয় দেখে স্যার গুরুদাস মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথকে 'নব বাল্মীকি প্রতিভা' বলে সম্বোধন করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম', রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি নাটকের

অভিনয়ও অনুষ্ঠিত হয় বিদ্বজ্জন সমাগমের প্রযোজনায়। বিদ্বজ্জন সমাগমের আমন্ত্রণপত্রের ওপরে লেখা থাকত—

বিদ্বজ্জন সমাগম।

শূন্য মা পূর্ণতামেতি মৃত্যুশ্চাপ্য মৃতায়তে
বিপৎ সম্পদি ভাবাতি বিদ্বজ্জন সমাগমাৎ।

ঠাকুরবাড়ির আর একটি বিখ্যাত সভা হল 'খামখেয়ালী সভা'। রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন এই সভার প্রাণপুরুষ। খামখেয়ালী সভার কাজকর্মও ছিল খামখেয়ালী। সভার নিমন্ত্রণপত্র লেখা হত শ্লেটে, একজন বাহক সেই শ্লেটখানি নিয়ে সভ্য এবং অভ্যাগতদের বাড়ি বাড়ি ঘুরত। নিমন্ত্রণপত্র বেশির ভাগই রচিত হত কবিতায়। আর সে কবিতাগুলিও ছিল অনবদ্য। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' স্মৃতিকথায় এমনি কয়েকটি নিমন্ত্রণপত্রের উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত একটি নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে—

এতদ্বারা নোটিফিকেশন
খামখেয়ালীর অধিবেশন।
চৌঠা শ্রাবণ শুভ সোমবার
জোড়াসাঁকো গলি ৬ নম্বার।
ঠিক ঘড়ি ধরা রাত সাড়ে সাত
সত্যপ্রসাদ কহে জোড় হাত।
যিনি রাজী আর যিনি গররাজী
অনুগ্রহ করে লিখে দেন আজই।

এই খামখেয়ালী সভার একটি অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সভার অন্যান্য যোগদানকারীরা হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ।

পত্নী-বিয়োগের পর দ্বিজেন্দ্রলালকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে যেসব সুধীজন দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়িতে যাতায়াত করতেন, তাঁদের আপ্যায়ন করার জন্যে দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'পূর্ণিমা-মিলন'। প্রতিমাসে পূর্ণিমার দিন এ সভার অধিবেশন হত। অধিবেশনে সাহিত্য-সঙ্গীতের সঙ্গে সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য পরিবেশিত হত।

রসস্রষ্টা সুকুমার রায় নিজেই ছিলেন অফুরন্ত রসের উৎস। তাঁর আকর্ষণে

যাঁরা সব সময়েই তাঁর কাছে ঘুরত, তাঁদের নিয়েই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ননসেন্স ক্লাব'। ক্লাবের একটি মুখপত্রও ছিল, নাম 'সাড়ে বত্রিশভাজা'। এই ক্লাবের সাহিত্যবাসর বসত প্রতি সোমবার। তাই কিছুদিন পরে সভার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'মণ্ডে ক্লাব'। সাহিত্য আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে থাকত অপর্যাপ্ত মণ্ডা-মিঠাই। অনেকে বলেন, এই খাওয়া-দাওয়ার আতিশয্যের জন্যে সভার নাম দাঁড়ায় 'মণ্ডা ক্লাব'। সভার উৎসাহী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—কালিদাস নাগ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, অতুলপ্রসাদ সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত প্রমুখ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই সভার জন্য একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সভা শুরু হত সেই গানটি গেয়ে—

আমাদের মণ্ডা সম্মেলন
আমাদের হল্লারই কুপন।

আচার্য সুনীতিকুমার, শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রভৃতি মিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্‌সটিটিউটের গাঁদা ফুলের বাগানে যে মজলিশ প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম ছিল 'মেরিগোল্ড ক্লাব'। রসরাজ রাজশেখর বসুর বাড়িতে ছিল এক আড্ডা, নাম ছিল 'উৎকেন্দ্র'। এই কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ বসু ভায়েরা হলেও, উদ্যোগী কর্ণধার ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্রশিল্পী যতীন্দ্র কুমার সেন।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৯৩২ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন এক সমিতি, অন্নদাশঙ্কর রায় তার নামকরন করেন 'বারোজনা'। সমিতির বারোজনা সদস্য ছিলেন—সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মমুদ হোসেন, আর্থার হিউজ, পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সর্বানীসহায় গুহ সরকার, হীরেন্দ্রলাল দে ও সুশোভন সরকার। এ সভার আয়ু ছিল তিন বছর। রাজশেখর বসুর ভাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'উৎকেন্দ্র'।

এ প্রসঙ্গে বাঙালি বিপ্লবীদের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯০২ সালে শ্রীঅরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মিলে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন 'অনুশীলন সমিতি'। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রতিষ্ঠা

করেন 'আত্মোন্নতি সমিতি'। সরলা দেবী চৌধুরানী প্রতিষ্ঠা করেন 'সুহৃদ সমিতি'।

মহিলা প্রতিষ্ঠিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমিতি হল 'সখি সমিতি'। প্রতিষ্ঠাত্রী হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর নামকরণ করেন। সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরে ঘোষণা করা হয় —'সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের পরস্পর সম্মিলন দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয় ও তাঁহারা দেশ-হিতকর কার্যে যত্নব্রতী হয়েন এই অভিপ্রায়ে প্রায় তিন বৎসর হইল কলিকাতায় সখি সমিতি নামক একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।' স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন সম্পাদিকা, অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, সরলা দেবী, সুরবালা দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মায়ার খেলা' নাটকটি রচনা করেন এই সমিতির অভিনয়ের জন্যেই। বাংলাদেশে মহিলাদের সেই প্রথম মঞ্চাভিনয়!

বাঙালি মনীষীদের তাসখেলা

তাসখেলার আবিষ্কর্তা এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচলিত থাকলেও, ভারতবর্ষে তাসখেলার শুরু যে মোঘল যুগেই হয়েছিল, একথা প্রায় সব বিশেষজ্ঞই স্বীকার করেছেন। মোঘল যুগে শুরু হলেও তাস খেলা জনপ্রিয় হতে কিন্তু বেশ সময় নিয়েছে। ভারতবর্ষের জমিদারী সভ্যতার সে-অলস অবসর অতিক্রম করে যন্ত্রজীবনের এই সংগ্রামী দিনে এসে পৌঁছতেও তাস খেলার অনেক সময় লেগেছে। নিতান্ত বুদ্ধিজীবী বা বিশেষ প্রবনতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাদ দিলে তাস খেলার প্রচলন সচ্ছল জীবনে বড় একটা দেখা যায়নি। বিংশ শতাব্দীর অসচ্ছল জীবনযাত্রা, নিরাপত্তাহীন অশান্ত জীবন এবং সামাজিক-রাজনৈতিক হট্টগোলের অনীহাতেও অনেকে তাস খেলা গ্রহণ করেছেন। আজ তাস খেলার যে সর্বজনপ্রিয়তা এবং সর্বজনবোধ্যতা—তার মূলের ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু এ যুগের ক্ষয়িষ্ণুতারই ফল !

তাসখেলার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, মস্তিষ্কের বিভিন্ন পেশীচালনা প্রভৃতি আকর্ষণ ছাড়াও, তাসখেলার একটা প্রচণ্ড আকর্ষনীয় আনন্দের দিক আছে। তাছাড়া অর্থ নৈতিক সঙ্কটের দিনে স্বল্পমূল্য, নামমাত্র আয়োজন এবং যেকোন পরিবেশে খেলার উপযোগিতার জন্যেও তাস খেলার জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কর্মনাশা বলে যত বদনামই থাক, বিনিময়ে প্রাপ্ত আনন্দ-টুকুর মূল্য যথেষ্ট বলেই তাসখেলা বন্ধ হয়নি, হবেও না। হয়তো এই আনন্দ প্রাপ্তির জন্যেই কর্মক্লান্ত দিনের শেষে পরিশ্রান্ত শ্রমিক-কর্মী, মস্তিষ্ক চালনায় বিপর্যস্ত শিক্ষক-রাজনীতিক-শিল্পীরা অনাবিল আনন্দলাভের আশাতে তাস খেলতে চান, খেলতে ভালবাসেনও।

পৃথিবীতে তাই বহু স্রষ্টাকেও তাসখেলায় বিভোর হতে দেখা গেছে। জার্মান কবি গ্যেটে, ইংরেজ কবি শেলী-কীটস তাস খেলার খুব ভক্ত ছিলেন। বাঙালি মনীষীদের মধ্যেও অনেকে তাস খেলতেন।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাস খেলায় ভীষণ আগ্রহী এবং উৎসাহী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর পদকৌলিন্য ছাড়াও তিনি অত্যন্ত ক্রোধী এবং রাসভারী প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু তিনি তাসখেলার সময়ে এমন সহজ

স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতেন যে, অনেকে বিস্মিত হতেন। এক নাগাড়ে বহুক্ষণ তাস খেলেও বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত বা ক্লান্তবোধ করতেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও তাসখেলায় আগ্রহ ছিল। তাঁর তাসখেলার সঙ্গী ছিলেন 'ফার্স্ট বুকে'র অমরস্রষ্টা প্যারীচরণ সরকার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণনগরে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে গেলে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে তাস খেলতেন। সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, দীনেশচন্দ্র সেন এবং কান্তকবি রজনীকান্তেরও তাস খেলায় খুব আগ্রহ ছিল। দীনেশচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'আমরা স্বয়াপুরে শ্রীনাথ গুপ্তের বাহিরের ঘরে বসিয়া তাস খেলিতাম। ...তাসখেলা তিন রকমের ছিল—ডাকের খেলা, দেখা বিন্তি ও বিন্তি বা গেরাবু। ডাকের খেলা তিনজনে, দেখা-বিন্তি দুইজনে এবং গেরাবু চারজনে খেলিতে হইত।'

রবীন্দ্রনাথের অবসর কম হলেও, তাস যে তিনি খেলতে ভালবাসতেন সেকথা তাঁর জীবনচরিত পাঠকেরা জানেন। তিনি স্নাপ এবং পোকার এই দুরকমের খেলাই বেশি খেলতেন। ইংলণ্ডে থাকাকালীন তিনি যে পয়সা দিয়েও খেলেছিলেন, সেকথাও তিনি একস্থানে বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাসখেলায় এত ভক্ত ছিলেন যে, তিনি তাস খেলতে বসলে তাঁর কোন কিছুরই ঠিক থাকত না। তাঁর মত অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মানুষও যে তাস খেলায় কত বিভোর হয়ে থাকতেন প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখে অবাক হয়ে যেতেন। তাঁর জীবনচরিতে জানা যায় যে তাঁর আই-সি-এস পরীক্ষা দেওয়া হয়নি তাসখেলার জন্যে। শ্রীঅরবিন্দের ভগিনী একটি পত্রে (১৭ মে, ১৮৪০) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—'সেজদা তখন তাস খেলিতে ছিলেন। তাঁহাকে উঠিবার জন্য তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি আর একটু খেলিয়া উঠিবেন বলিয়া দেরী করিতেছেন। তাহার পর তিনি যখন পরীক্ষা দিতে গেলেন তখন সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় আর তাঁহাকে পরীক্ষা (আই-সি-এস) দিতে দেওয়া হয় নাই।'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও তাসখেলার ভীষণ ভক্ত ছিলেন। তিনি খেলতেনও অদ্ভুত। তবে তিনি ব্রীজ, পোকার বা ঐ ধরনের-কোন খেলা খেলতেন না। তিনি একটি মাত্র খেলা খেলতেন—সেটি গ্রাবু। বাসন্তী দেবী খেলতে বসে রাগ করে উঠে গেলে তিনি যে শিশুর মত চঞ্চল হয়ে তাঁর মান-অভিমান ভেঙে তাস খেলতে বসাতেন, সেকথা তাঁর জীবনচরিতে জানা যায়। কথাশিল্পী

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর-স্মৃতিকথায় চিত্তরঞ্জনের তাস খেলা সম্পর্কে লিখেছেন—'চিত্তরঞ্জন তাস খেলতে যেমন ভালবাসতেন, খেলতে পারতেনও তেমনি অদ্ভুত। ব্রীজ, পোকার কিংবা অপর কোন ইউরোপীয় খেলা তিনি খেলতেন না;—একমাত্র খেলতেন বত্রিশ তাসের গ্রাবু খেলা। আর খেলবার সময় সেই বত্রিশখানা তাসের এমন বিস্ময়জনক সন্ধান রাখতেন যে, তাঁর গোলামের হাতে নিজের চোদ্দ ধরা দিয়ে বাসন্তী দেবী কুপিত হয়ে বলতেন, "তুমি চুরি করে আমার হাত দেখ", ওরূপ ঘটনার পৌনঃপুনিকতা দেখে সে কথা একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হত না।'

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও তাস খেলতে ভালবাসতেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাস খেলার খুব ভক্ত ছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসেও তাসখেলার বহু দৃশ্য চিত্রিত আছে। সেকালের অনেক বাঙালি মনীষী ঠাকুরবাড়িতে বসে তাস খেলতেন। ঠাকুরবাড়ির পূর্ব-পুরুষদের নৌকাযোগে ঘটা করে তাসখেলার-কথা অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় স্মরণ করেছেন। নাট্যজীবনে নানা ব্যস্ততার মধ্যেও গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল বসু যে কী রকম উৎসাহ এবং আনন্দে তাস খেলতেন সেকথা তাঁদের জীবন চরিত -পাঠকেরা জানেন।

মনীষী জীবনের এসব দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁরা তাস খেলতেন আনন্দলাভের জন্যে—তথাকথিত সময় হত্যা করার জন্য নয়। এবং সর্বনাশা বদনামের কোন আঁচড়ই যে সেসব কীর্তিমানদের কর্মজীবনে লাগেনি, সেকথা মহাকালও স্বীকার করেছে। আর তাঁদের এই তন্ময়তা যে কাজেও কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি সেটাই আমাদের কাছে মস্ত বড় সান্ত্বনা!

বাঙালি মনীষীর প্রণয়

স্রষ্টা সৃষ্টি করেন, তাঁদের সৃষ্ট নায়কনায়িকার প্রেম যুগ-যুগান্ত ধরে মানুষকে অনাবিল আনন্দ দেয়। স্রষ্টাদের মধ্যে অনেকে আবার নিজেও বিচিত্র প্রেমিকের জীবন যাপন করেছেন। সত্যিকারের প্রেম যে অন্ধ—এইসব স্রষ্টাদের প্রেম-কাহিনী পাঠ করলে সেটা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। তাঁদের সৃষ্টির মত তাঁরাও তাই দেখা যায় প্রেমের পথে নিজেদের রিক্ত নিঃস্ব করেছেন।

বিশ্ব সাহিত্যের অমর স্রষ্টাদের মধ্যে তাই শেক্সপীয়র, বালজাক, গোর্কী, টলস্টয়, শেলী, কীটস, বার্নাড শ কিংবা এডগার অ্যালেন পো-র প্রেম কাহিনী যে কোন রমনীয় উপন্যাসের চেয়ে রোমাঞ্চকর এবং উপভোগ্য। শুধু পত্নী হিসেবেই নয়, অ্যানা হ্যাথওয়ে শেক্সপীয়রের জীবনে প্রেমিকা হিসাবেও উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া মহাকবির আরও দুই প্রণয়িনী ছিলেন—মেরী ফিটন এবং অ্যান ড্যাভেনেন্ট, কাল মার্কসের জীবনে জেনি কিংবা কীটসের জীবনে ফ্যানি ব্রাউন অনেক সাফল্য, অনেক আনন্দ বিষাদের সঙ্গে জড়িত। শেলীর কবিপত্নী মেরী মহাকবি শেলীর প্রথমা প্রেমিকা হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুককে নিয়ে Zodore নামে একটি প্রেমকাব্যও রচনা করেন। ব্রাউনিং কবি-দম্পতিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁদের প্রণয়কাহিনী যে-কোন প্রেমকাব্যের উপজীব্য হতে পারে।

মহাকবি তাসো ছিলেন ফেরারার ডিউকের সভাকবি। কিন্তু ডিউকের বোন লিওনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁর জীবন যে কি ভীষণ বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছিল, তাঁর জীবনী পাঠকেরা তা জানেন। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তিনি গারদে বন্দী ছিলেন সুদীর্ঘকাল। মহাকবি গ্যেটে এই কাহিনী নিয়ে কাব্য-নাটক রচনা করেছিলেন, আর বায়রণ লিখেছিলেন 'দি ল্যামেণ্ট অব তাসো' নামে সুবিখ্যাত কবিতাটি।

শাণিত চরিত্রের মানুষ বলে পরিচিত বার্ণার্ড শ'র জীবনে একে একে এসেছেন—এলিস লকেট, জেম, গ্রেস, জেরান ডাইন, অ্যানি বেসাণ্ট, মিসেস প্যাটারসন, ফ্লোরেন্স ফার প্রমুখ নারী।

না-পাওয়ার অমর চিত্রও আছে। পারস্যের অমর কবি হাফিজ পাগল হয়েছিলেন সাকী নবাৎ নামে এক তুর্কী সুন্দরীর প্রেমে। তাঁর সেই বেদনা-ব্যথিত প্রেমোচ্ছ্বাস আজও যে কোনও প্রেমিকের ঈর্ষার বস্তু হতে পারে। তাঁর সেই অবিস্মরণীয় উক্তি যুগে যুগে মানুষকে তাঁর প্রেমের গভীরতার কথা শোনাবে। তিনি বলেছিলেন—'সিরাজের সেই তুর্কী সুন্দরী যদি আমার হৃদয় গ্রহণ করে, তাহলে আমি তার চিবুকের কালো তিলটির জন্য সমগ্র বুখারা ও সমরখন্দ দিতে প্রস্তুত আছি।'

বাঙালি মনীষীর প্রণয় পর্বও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। একটি যুগের অধীশ্বর রামমোহন সমস্ত দিক দিয়েই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পুরুষ। রূপে গুণে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে বীর্যে পৌরুষে তাঁর মত ব্যক্তি শুধু সে যুগেই নয়, যে কোন যুগেই দুর্লভ। রামমোহনের একজন মুসলমান প্রণয়িনীর কথা জানিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে তাঁর জীবনের এই দিকটি প্রকাশ করেছিলেন।

বাঙালি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দাম্পত্য জীবনে সুখী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় কবির স্ত্রী 'দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিত! হাবা! নেবার মত! এত স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্ধাঙ্গ নহে, কবির সহধর্মিনী নহে।' শোনা যায় কবি তাঁর পত্নীর সঙ্গে কখনও কথা বলেন নি, এর পিছনে স্ত্রীর বাহ্যিক রূপই শুধু নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যত্র একটু প্রণয়ের আভাষও পাওয়া যায়। সাহিত্য সম্রাট লিখেছেন—'ইহার ভিতরে একটু Romanceও আছে। শুনা যায় ঈশ্বরচন্দ্র কাঁচড়াপাড়ার একজন ধনবানের একটি পরমাসুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করতে অভিলাষী হয়েন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন।'

মাইকেল মধুসূদনের রেবেকা-হেনরিয়েটার প্রণয়পর্ব তাঁর জীবন চরিত পাঠকের অজানা নয়। মধুসূদন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদুষী কন্যা দেবকীর অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। দেবকীকে জীবনসঙ্গিণীরূপে পেতে তাঁর আকাঙ্খার অন্ত ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মিলন সম্ভব হয় নি। বিয়োগান্ত কাব্যের কবির নিজের জীবনও মিলনান্ত হয় নি। দেবকীর সঙ্গে পরে স্টুয়ার্ট নামে এক ভদ্রলোকের বিয়ে হয়।

কৃষ্ণমোহনের প্রথমা কন্যা কমলার সঙ্গে প্রথম বাঙালি ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুরের প্রণয় অবশ্য মিলনান্ত হয়েছিল। তরুণ বয়সে জ্ঞানেন্দ্রমোহন

কৃষ্ণমোহনের কাছে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নেন এবং তাঁর কন্যা কমলার পাণিগ্রহণ করেন, এঘটনায় বাংলাদেশে রীতিমত আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তখন যে সব রহস্যপূর্ণ কবিতা রচিত ও প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে একটি অংশত উল্লেখযোগ্য—

ভূতির মা বলে দিদি রয়েছিস কি সুখে।
বড় হলো মিসি বাবা.........উঠল বুকে॥
বিবি বলে সাহেব কি মোর রয়েছে চুপ করে।
জ্ঞানের অজ্ঞান করে আনিয়াছে হরে॥
এই মার্চে লাল চার্চে মিসির হবে ম্যারেজ।
দেখবে ঘটা, বলব কথা লাগবে এসে ক্যারেজ॥

নবীনচন্দ্র বিদ্যুত নামে এক রমনীর সঙ্গে তাঁর বাল্য প্রণয়ের কথা জীবন চরিতে লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিংবা গিরিশচন্দ্রের কাব্যপাঠ করলেও তাঁদের গোপনচারিনীদের আবিষ্কার করা সম্ভব।

নজরুল ইসলামের জীবনে পত্নী প্রমীলার অংশ অনেকখানি হলেও তাঁর প্রথম জীবনের প্রেমিকা নার্গিসের কথাও স্মর্তব্য। সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস বেগমের সঙ্গে নজরুলের প্রণয় সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' গ্রন্থের তৃতীয় মুদ্রনের ভূমিকায় একস্থানে লিখেছিলেন—'সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস বেগমের বিয়ে (অকদ) হয়নি এই সম্বন্ধে আমি স্থির নিশ্চিত হয়েছি। তাঁর মুসাবিদা করা কাবিন নামায় একটি সর্ত এই ছিল যে, কাজী নজরুল ইসলাম দৌলৎপুর গ্রামে এসে নার্গিস বেগমের সঙ্গে বাস করতে পারবে, কিন্তু নার্গিস বেগমকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না। এই সর্ত নজরুল ইসলামের পৌরুষে বেধেছিল। তাই সে বিয়ে না করেই বিয়ের মজলিস হতে উঠে রাত্রেই পায়ে হেঁটে কুমিল্লা চলে যায়।

কথাশিল্পী প্রভাতকুমারের সঙ্গে সরলাদেবীর প্রণয়ও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁদের এই রোমান্সের কথা হেমেন্দ্র কুমার রায় তাঁর—'যাঁদের দেখেছি' গ্রন্থে লিখেছেন 'হঠাৎ দেখলুম এক রোমান্সের কাহিনী। স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্যাবতী ও লেখিকা কন্যা সরলা দেবী প্রভাতকুমারের গল্প পাঠ করে তাঁর প্রতি অনুরাগিনী হয়েছেন। শীঘ্রই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন।' এই প্রণয় পর্ব নিয়ে দেশের সাহিত্য বৈঠকগুলি সরগরম হয়ে ওঠে। জায়গায় জায়গায় আলোচনা শুরু হয়। সরলা দেবীর উপযুক্ত করে তোলার

জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভাতকুমারকে ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত পাঠান। প্রভাতকুমার ব্যারিস্টার হয়ে হয়ে দেশে ফেরেন, কিন্তু তাঁদের বিয়ে হয় নি। কোন কোন চরিতকার মন্তব্য করেছেন, প্রভাতকুমার মাতার সম্মতি পান নি বলে বিয়ে হয় নি।

কবি কামিনী রায়ের সঙ্গে প্রণয় ছিল জগদীশচন্দ্র বসুর। কিন্তু তাঁদেরও বিয়ে হয় নি। এই বিরহেরই ফলশ্রুতি হল 'আলোছায়া' কাব্য। কথিত আছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও চিরকুমার থাকেন এই কামিনী রায়কে ভালবেসেই। মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা দেবীকে ভালবেসেছিলেন প্রসিদ্ধ জাপানী শিল্পী ওকাকুরা। কবির একটি ছবিও তিনি এঁকেছিলেন। প্রিয়ম্বদা দেবীর সঙ্গে পত্নীবিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথেরও বিয়ের কথা হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজী হন নি।

অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে তাঁর মামাতো বোন হেমকুসুমের প্রণয় মিলন ও বিরহ যে কোন প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের উপজীব্য হতে পারে। নিধুবাবু ওরফে রামনিধি গুপ্তের সঙ্গে শ্রীমতী নামে এক গণিকার প্রেম এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। শ্রীমতীকে নিয়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত টপ্পাটি রচনা করেছিলেন—'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে'। চণ্ডীদাসের রামীও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য !

বিপ্লবী রাসবিহারীর সঙ্গে জাপানী মহিলা তোশিকোর প্রণয় ও বিবাহ যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি সুগভীর। বিয়ের পর পাঁচ বছর তাঁরা একবার সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে পারেন নি, বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার কাশীতে বেড়াতে গিয়ে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কলকাতার এক বিধবা রমনী শৈলজাসুন্দরীর। তাঁর দুই পুত্রের বয়স তখন আঠারো ও ষোল। তাঁদের প্রণয় পর্ব শেষ পরিণতি লাভ করে কলিকাতার ম্যারেজ রেজিস্ট্রী অফিসে, বিবাহের মাধ্যমে। এই বিবাহে বারীন্দ্রকুমারের জীবন কিছুটা স্থিতিলাভ করে।

বারীন্দ্রকুমার তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর প্রথম প্রণয় সম্পর্কে অন্যকথা লিখেছেন। এবারের নায়িকা হলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগিনী। বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন—'আমার প্রথম প্রেম ছিল অশ্রুতে ভরা। বিষাদ-কুয়াশায় আচ্ছন্ন কোজাগরী রাত। বার বছরেরটি হয়ে সে ভালবাসতো আমার এক মাসতুতো ভাইকে। আমার দিকে তার রূপমদির চোখে কতই না অবহেলায় আঁচল উড়িয়ে চলে যেত। আমার বুকটা নিংড়ে সে রূপোদার

দলে গিয়ে মিশে কপাটি খেলতো। আমার দুচোখ ফাটিয়ে জল বের করে অম্লান বদনে তারই হাত ধরে বেড়াতে বেরুতো। আমার জগৎ সংসার উদাস করে দিয়ে তারই পাশটি ঘেঁষেই বনভোজন বসতো। আমি আর সহ্য করতে না পেরে মাঠের মাঝে পাথরের উপর গিয়ে চুরমার করা আবেগে বিরহের কবিতা লিখতুম।'

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রণয় এবং বিবাহ যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি বৈপ্লবিক। তাঁদের অনুরাগ ছিল আবাল্য কিন্তু যৌবনে মিলন সম্ভব হয়নি, কারণ উল্লাসকর তখন দ্বীপান্তরে। প্রৌঢ় হয়ে তখন উল্লাসকর ফিরলেন, তখন প্রেমিকা পক্ষাঘাতে পঙ্গু। কিন্তু প্রেম অবিনশ্বর। উল্লাসকর সেই স্থবির মাংস পিণ্ডটিকেই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রেম এবং সেবা পেয়ে ধন্য হলেন তাঁর প্রণয়িণী।

দুটি রোমাঞ্চকর প্রণয় কাহিনীও আছে। বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রথম ঋত্বিক রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বর্ধমান মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের বিধবা পত্নী বসন্তকুমারীর পরিণয় বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রবাসী বাঙ্গালী বীর কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস হলেন দ্বিতীয় কাহিনীর নায়ক। সুরেশচন্দ্রের জীবনের মত তাঁর প্রণয়ও রোমাঞ্চকর ছিল। তিনি যখন সার্কাস কোম্পানীতে চাকরী করতেন, তখন জার্মানীতে এক প্রদর্শনীতে নায়িকার দর্শন লাভ করেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম। কিন্তু বড় করুণ পরিণতিতে এ পর্ব শেষ হয়। একজন কৃষ্ণকায় ভারতীয়ের সঙ্গে ধনী-দুহিতার প্রেমকে কেউ ভাল চোখে দেখেননি। তারা তাঁর প্রাণসংহারের চেষ্টা করলে সুরেশচন্দ্র রাত্রের অন্ধকারে আমেরিকা পালান। বাকী জীবনটা তাঁর সেইখানেই কাটে।

মনীষী জীবন এমনই বিচিত্র। তাঁরা যখন যা করেন, বিভোর হয়েই করেন। যাকে যা বিলিয়ে দেন, উজাড় করেই দেন। মিলনান্ত কিংবা বিয়োগান্ত—পরিণতি যাই হোক, প্রণয়ে তাঁদের কোন ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। বিবহোত্তর প্রেমপর্বেও তাই বহু স্রষ্টাই এই উজাড়করা প্রেমের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সুরবালা দেবীর বিয়োগ ব্যথায় উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, কিংবা পত্নী-বিয়োগ ব্যাকুল অক্ষয়কুমার বড়াল বা রবীন্দ্রনাথের বিরহ-বেদনা যে-

কোন ক্যাবের বিষয়বস্তু হতে পারে। পত্নী বিরহে এমনি ব্যথিত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'উদভ্রান্ত প্রেম' গদ্যকাব্য লিখে বাংলা সাহিত্য চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। সৃষ্টির মধ্যে বর্ণিত প্রেমই নয়, স্রষ্টার জীবনে অনুসৃত প্রেমও চিরন্তন আনন্দ ও উপভোগের উৎস হয়ে আছে!

বাঙালি মনীষীর বিচিত্র বাতিক

প্রায় প্রতিটি মানুষেরই একটা না একটা বাতিক আছে। কারও বেড়ানোর, কারও বাগান করার, কারও তাস-দাবা খেলার, কারও জীবজন্তু পোষার, কারও শিকার বা মাছধরার। বাঙালি মনীষীদের জীবন-ইতিহাস পড়লে লক্ষ্য করা যায়, তাঁদেরও কত না বিচিত্র শখ বা বাতিক ছিল। কর্মযজ্ঞে যাঁদের নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম, এ সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ বাতিকেও তাঁদের মনোযোগ কিছু কম ছিল না।

প্রথমেই ধরা যাক বেড়ানোর বাতিক। বাঙালি মনীষীদের মধ্যে অনেকেই বেড়াতে ভালবাসতেন। গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত পদব্রজে ভ্রমণ করতে খুব ভালবাসতেন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নিয়ম করে আট দশ মাইল হাঁটতেন। স্যার নীলরতন সরকারও হাঁটতে ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথ খুব ভ্রমণবিলাসী ছিলেন। তবে পাহাড় পছন্দ করতেন না একদম, নদীতীরই বেশি পছন্দ করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন বেড়াতে যেতেন, তখন সঙ্গে যেত একটি বিরাট সংসার। আনন্দের বিনিময়ে কোন কষ্ট-স্বীকার করতে চাইতেন না তিনি। নৌকাবিহারের বাতিক ছিল প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের। রামগোপাল ঘোষ এবং রাজনারায়ণ বসুও মাঝে মাঝে নৌকা-বিহার করতেন।

বাগান করার বাতিক ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। তিনি ভালবাসতেন ফুল-বাগান। তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রেরও ফুলবাগানের বাতিক ছিল। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ, প্যারীচরণ সরকার এবং অমৃতলাল বসুরও ফুলবাগান করার নেশা ছিল। ফলবাগানের বাতিক ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের। শিবচন্দ্র দেব এবং 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষেরও ফলবাগান করার বাতিক ছিল। এ দিকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মনীষী হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর বালির বসতবাড়িটি যে-কোন নার্সারীর চেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। তাঁর সংগ্রহে কোন্ গাছটা যে ছিল না! দেশবিদেশ থেকে তিনি নানা গাছের চারা আনান। আর কোরিয়া, থুজা, সাইপেরস, জুনিপেরস, কোলিয়স, কমব্রিটম, ইরান্সিন্নম, প্রভৃতি দুর্লভ গাছের সঙ্গে দারুচিনি, লবঙ্গ, চন্দন, হরীতকী প্রভৃতি গাছও বাদ

ছিল না। অক্ষয়কুমারের শুধু বাগানের শখই ছিল না, ঘরগুলিও সাজিয়ে রেখেছিলেন শঙ্খ, প্রবাল, নানাদেশের মুদ্রা, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি, বাঘ ও সাপের চামড়া, নানাপ্রকার মানচিত্র, মনীষীদের ছবি ইত্যাদি দিয়ে। এজন্যে সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার পরিহাসছলে অক্ষয়কুমারের এই মনোরম বাড়িটির নাম দেন—'চারুপাঠ পঞ্চম ভাগ।' অক্ষয়কুমারের সুবিখ্যাত গ্রন্থ চারুপাঠের চারটি ভাগ ছিল।

মাছধরার বাতিক ছিল শরৎচন্দ্রের। তিনি বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করতেন এই বাতিকের জন্যে। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মাছ ধরতে বসে খাওয়াদাওয়া ভুলে যেতেন। শিশুসাহিত্যের অমর স্রষ্টা যোগীন্দ্রনাথ সরকারও মাছ ধরতে খুব ভালবাসতেন। একবার তাঁর এক বন্ধু মাছ ধরার একটি সুন্দর চার তৈরি করে নাম দেন 'ইধর আও,' যোগীন্দ্রনাথও অনুরূপ সুগন্ধি একটি চার তৈরি করে নাম দিয়েছিলেন 'উধর মাৎ যাও'। মাছ নয়, সত্যিকার শিকারের নেশা ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের। রবীন্দ্রনাথও যে একবার জ্যোতিদাদার সঙ্গে গিয়ে একটি বাঘ মেরেছিলেন, সে কথা তাঁর জীবনী-পাঠকেরা জানেন।

জীবজন্তু পোষার বাতিক ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর এই বাতিক সম্পর্কে আত্মচরিতে লিখেছেন —'পুষি নাই এমন জন্তুই নাই। টুনটুনি, বুলবুলি, দোয়েল, ছাতারে, শালিক, টিয়া ও সকল তো পুষিয়াছি, পিঁপড়াও পুষিতাম, ফড়িং ও পিঁপড়া পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। বনের পাখি পুষতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। তিনি বাইরে এসে বসলেই অজস্র চড়াই-শালিক এসে বসত তাঁর গায়ে, মাথায়। এঁদের সঙ্গে তাঁর কিরূপ সম্পর্ক ছিল, সেটি সুস্পষ্ট হয়েছে গগনেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে—'গগন, আমার সব পাখিরা আসে খেতে। তার মধ্যে একটা শালিক কদিন হোল আসছে না। আমার মন খারাপ হয়ে আছে। তাকে আমি একটু বকেছিলুম। বলেছিলুম, খাবার সময় তুমি বড় বিরক্ত করছ। সেই দিন থেকে সে অভিমান করে আর আসেনি।' কদিন পরে আবার চিঠিতে লিখেছেন—'আমার শালিক ফিরে এসেছে।'

তাসখেলার বাতিক ছিল বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের। বিদ্যাসাগরের তাসখেলার সঙ্গী ছিলেন প্যারীচরণ সরকার। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ, চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দও তাস খেলতে খুব ভালবাসতেন। দাবাখেলার

নেশা ছিল রজনীকান্ত, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল ও শরৎচন্দ্রের। রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে দাবা খেলতেন কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে। শরৎচন্দ্র দাবাখেলার সময় খুব রসিকতা করতেন। নৌকো মারলে বলতেন, নৌকোটা ফুটো ছিল, ঘোড়া মারলে বলতেন, ঘোড়াটা বেতো। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও দাবা খেলতেন।

বাঙালি মনীষীদের মধ্যে অভিনয় এবং গানবাজনার শখ ছিল অনেকের। গানের ভাল গলা যাঁদের ছিল—তাঁদের মধ্যে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় সহপাঠীদের গান শুনিয়ে তিনি প্রভূত আনন্দ দিতেন। পরবর্তী কালে তাঁর কণ্ঠস্বর অবশ্য একেবারে ভেঙে যায়। গানের গলা ভাল না থাকলেও, শুনতে ভালোবাসতেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, শরৎচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জন। শরৎচন্দ্রের গান সংগ্রহের খাতা আজও বর্তমান, তাতে তিনি অনেক রচনার মকস করেছিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষও সঙ্গীতে খুব আগ্রহী ছিলেন। নাট্যাভিনয়ের বাতিক প্রায় সব মনীষীরই ছিল।

যন্ত্রসঙ্গীতে আগ্রহ ছিল নবীনচন্দ্র সেনের। তিনি ভালো বাঁশি বাজাতেন। পাখোয়াজ বাজাতেন জগদিন্দ্রনাথ রায়। পিয়ানো বাজাতে দক্ষ ছিলেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাঁশি ভাল বাজাতেন। এস্রাজ বাজাতেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

মনীষীজীবনের সবচেয়ে বড় বস্তু হল সাধনা ও নিষ্ঠা। এই সব বাতিক যে তাঁদের সাধনা ও নিষ্ঠাকে আরও একাগ্র ও ফলপ্রসূ করে নি, তাই বা কে বলতে পারে!

মনীষীদের বিচিত্র রুচি

মনীষীদের জীবন আলোচনা করলে দেখা যায়—অনেকে যেমন নিজের রুচি বা পছন্দ সম্পর্কে কিছুই মনে রাখতেন না, অনেকে তেমনি আবার নিজের রুচি সম্পর্কে অতি সচেতন ছিলেন। অন্যমনস্ক হয়ে নিউটন ঘড়ি সিদ্ধ করেছিলেন, ট্রামে বাসে উঠে আইনস্টাইন প্রায়ই গন্তব্যস্থান ভুলে যেতেন। এরা পৃথক্ জাতের চরিত্র। অপর দিকে দার্শনিক এরিস্টটল সাজসজ্জায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। প্রথম জীবনে টলস্টয়ও সাজসজ্জায় খুব মনোযোগী ছিলেন। গ্যেটে শুধু সাজসজ্জাতেই পরিপাটি ছিলেন না, কেশপ্রসাধনেও তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। পরচুলা স্থানভ্রষ্ট হবার ভয়ে তিনি অত্যন্ত সংযত হয়ে চলাফেরা করতেন। রামমোহনের বাবরী চুল ছিল। তিনি স্নানের পর প্রতিদিন আয়নার সামনে কেশবিন্যাসে অনেক সময় নষ্ট করতেন। রামমোহনের বাবরী চুল স্থানভ্রষ্ট হবার ভয়ে তিনি অত্যন্ত সংযত হয়ে চলাফেরা করতেন। লালকোট এবং সাদা টুপি পরা ডিকেন্সের কথাও অনেকে উল্লেখ করেছেন। এদিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখনীয় হলো বালজাক। তাঁর বিলাসিতা ছিল অত্যধিক। সাজ-সজ্জা ছাড়া সৌখিন জিনিস কেনারও শখ ছিল তাঁর। তিনি ফ্রান্সের ফার্নিচার, চীনের পোরসেলিন' পারস্যের কারপেট, ইংলণ্ডের-সিলভার-প্লেট, বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি—এ সব সংগ্রহ করতেন। তাঁর হাতে সর্বদা থাকত একটি সুন্দর কারুকার্য করা ছড়ি—সোনায় বাঁধানো সে ছড়ির মাথায় খোদাই করা ছিল একজন তুর্কী সম্রাটের বাণী : I am conqueror of all difficulties।

বাঙালি মনীষীদের মধ্যেও অনেকের পোষাকপরিচ্ছদ এবং আহারাদির ব্যাপারে বিচিত্র রুচির পরিচয় পাওয়া গেছে। রামমোহনের প্রিয় ছিল মাগুর মাছ, রামকমল সেনের জিলিপি। রামকৃষ্ণদেব ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভালবাসতেন বোঁদে। ডেভিড হেয়ার ভালবাসতেন নারকেল আর দুধ। স্যার গুরুদাস আম খেতে ভালবাসতেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভালবাসতেন বড়ি। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল ডালবাটা সিদ্ধ।

মাংসাহারে রুচি ছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর। প্রথম জীবনের তাঁর এই মাংস-প্রীতির কথা তিনি আত্মচরিতে লিখেছেন—"মাংসাহারে এমনই আসক্তি ছিল যে, ভবানীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ীতে বাসকালে প্রায় প্রতি রবিবার প্রাতে যখন কালীঘাট হইতে জীবন্ত পাঁঠা আসিত, সে পাঁঠার ডাক শুনিলেই আমার পড়াশোনা বন্ধ হইত। তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া পেটে না পুরিতে পারিলে আর কিছু করিতে পারিতাম না।"

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও ভীষণ ভক্ত ছিলেন মাংসের। 'পাঁঠা' কবিতায় তাঁর এই আগ্রহ উপচে পড়েছে। পাঁঠার গুনগান শেষ করে শেষ পর্যন্ত তার বোকা নামের জন্যে গালিগালাজ বন্ধ করতে ছাড়েননি—

এমন পাঁঠার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা।।

চিকিৎসকের পরামর্শে গুগলি খাওয়া শুরু করলেও অক্ষয়কুমার দত্ত পরবর্তী জীবনে গুগলির ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। গুপ্তকবি তাই ব্যঙ্গ করে 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁর সম্পর্কে লেখেন—

আমিষ অবিধি বোলে যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায়, শামুকের ঝোল।।
নোদে শান্তিপুর ফিরে, ফিরিয়া হুগলী।
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলী।।

প্রসঙ্গ উল্লেখনীয়, অক্ষয়কুমার আমিষ-আহারের বিরোধী ছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভালবাসতেন শুঁটকি মাছ। লীলা মজুমদার স্মৃতি কথার একস্থানে লিখেছেন—'আমাদের দেখেই দিনদা বললেন, 'তেজু (তেজেশচন্দ্র সেন) তোদের জন্য একটা আশ্চর্য জিনিস রাঁধছে, রান্নাঘরে গিয়ে দেখে আয়।' রান্নাঘরের কাছে গিয়ে দুর্গন্ধে টিকতে পারি না। মাগো, তেজু-বাবু শুঁটকি রাঁধছেন। যদ্দূর মনে পড়ে উনি শ্রীহট্টের ছেলে। আমাদের প্রতিক্রিয়া দেখে দিনদা চটে কাঁই! ভালো জিনিস ভালো লাগবে কেন? রাঁধলে মোটেই গন্ধ থাকে না! ইত্যাদি কত কি বললেন! খেতে বসে আমরা শুঁটকি মাছ ভাত চাপা দিয়ে লুকোই, আর দিনদা নিজে পায়েস খাবার পরেও আর এক গ্রাস শুঁটকি খেয়ে মুখশুদ্ধি করলেন!'

খাওয়াদাওয়া যেমন, পোষাকের ব্যাপারেও অনেক মনীষী এক একটি বিশিষ্ট জিনিষ পছন্দ করতেন। ডেভিড হেয়ার সবুজ রঙের কোট পরতে

ভালবাসতেন। রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —'যে জাতির যাহা ভাল, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন। মুসলমানের পোষাক, চাপকান ও পাগড়ি পরিধান করিতেন। ইংরেজের গৃহসজ্জা ব্যবহার করিতেন এবং বাঙালীর অভ্যাস তৈলমর্দন করিতেন।'

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লাল রঙের পোষাক বড় পছন্দ করতেন। আগাগোড়া লাল মখমলের পোষাক, লাল টুপি পরেও কোন সভায় যেতে তাঁর সঙ্কোচ ছিল না। অথচ তাঁর পোষাক দেখে অন্য সবাই অবাক হয়ে যেতেন। কবি তরু দত্ত মসলিনের পোষাক পরতে বড় ভালবাসতেন। চিত্তরঞ্জন ঢাকাই মসলিনের পরিচ্ছদ বা খুব ভাল কাপড়ের পোষাক ভিন্ন অঙ্গেই তুলতেন না। পরবর্তী জীবনে অবশ্য তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন। প্রভাত-কুমার কোট ও প্যাণ্টই পছন্দ করতেন বেশী। 'সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী' নামে একটি প্রবন্ধে একবার তিনি লেখেন 'আমাদের ধুতি চাদরের মত effiminate পোষাক আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই পোষাক ত্যাগ করিয়া বিলাতী পোষাক পরাই ভাল।'

মধুসূদনের পোষাক-পরিচ্ছদে পারিপাট্য ছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি দিনে চার-পাঁচ বার পরিচ্ছদ পরিবর্তন করতেন এবং নিত্য নতুন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। একদিন চুলছাঁটা মনোমত হওয়ায় তিনি এক সাহেব নাপিতকে একটি মোহর দিয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেড়াতে যাবার সময় জামার বোতাম বন্ধ করতেন না। একটা উল্টো করে পরে পরেরটা সোজা করে পরতেন, ফলে বোতাম দেবার দরকার হত না। জামার লম্বা আস্তিনগুলো ফিতে দিয়ে জড়িয়ে নিতেন। শিশিরকুমার ঘোষও জামা প্রায়ই উল্টো করে পরতেন। মাঝে মাঝে তিনি মাথায় একটা সোনার টুপি নিতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঝোলা চাপকান জাতীয় পোষাক পছন্দ করতেন—সে কথা তাঁর জীবনে নানা ঘটনায় জানা গেছে। তিনি কটকী জুতোরও যে ভক্ত ছিলেন, রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' পাঠে তাও জানা যায়। নদীপথে যেতে যেতে একবার কবির একপাটি জুতো পড়ে যায়, তিনি সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সাঁতার কেটে একপাটি চটি তুলে আনেন। মহাত্মা গান্ধীও চটি পছন্দ করতেন। যীশু খৃষ্টও যে চটি পছন্দ করতেন, তা তাঁর

একটি বাণী স্মরণ করলে বোঝা যায়। যীশু বলেছেন—But be shod with Sandels.

স্রষ্টার জীবনে ঐকান্তিকতাই সবচেয়ে বড় বস্তু। আহার এবং পোষাক-পরিচ্ছদে ঐকান্তিক হয়েও যে তাঁরা তাঁদের অভীষ্টসাধনায় সিদ্ধিলাভ করতো না, তাই বা কে বলতে পারে।

বাঙালি মনীষীর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ

আমাদের দেশে শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং সংস্কৃতির কল্যাণে ধর্মের ব্যাপারে অনেক গোঁড়ামি কমেছে। কিন্তু বাংলাদেশে একদিন ধর্মের অনুশাসন ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। তাই প্রচলিত বিধিনিষেধ এবং এবং ধর্মের গণ্ডী যাঁরা টপকাতে পেরেছিলেন, তাঁদের নিয়ে এদেশে কম ঝড়তুফান ওঠে নি। বাঙালি মনীষীদের মধ্যে কয়েকজন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে সেই ঝড় আরও বাড়িয়েছিলেন, সন্দেহ নেই।

বাঙালি মনীষীদের মধ্যে সর্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ইয়ং বেঙ্গলের সর্বাধিক' বুদ্ধিদীপ্ত মনীষা কৃষ্ণমোহনের ধর্মান্তর, তাই এ দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অত্যুগ্র আলোকে যে-মুহূর্তে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই তিনি আলেকজাণ্ডার ডাফের সংস্পর্শে আসেন। বাড়ি থেকে চলে এসে, এই ডাফের গৃহেই তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৩২ সালের ১৬ই অক্টোবর। দীক্ষা দেন ডাফ সাহেব নিজে। কৃষ্ণমোহন অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরেজি তিনটি ভাষাতেই তাঁর অনায়াস-সাফল্য লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তী মনীষী হলেন মধুসূদন। মধুসূদনের খৃষ্টধর্মগ্রহণের ইতিবৃত্ত তাঁর জীবনীপাঠকের অজানা নয়। তাঁর ধর্মান্তরগ্রহণের পর্বে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে মধুসূদনের যাতায়াত ছিল এবং কৃষ্ণমোহননের দ্বিতীয়া বিদুষী কন্যা দেবকীর গুণমুগ্ধ অনুরক্তদের মধ্যে তিনিও অন্যতম ছিলেন। মধুসূদন যেদিন খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন, সেই ঐতিহাসিক দিনটি হল বৃহস্পতিবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৩। ধর্মান্তরপর্ব অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা মিশন রো-তে অবস্থিত ওল্ড মিশন চার্চে; দীক্ষা দেন গীর্জাধিপতি আর্চ ডিকন ডিয়ালট্রি। সাক্ষী ছিলেন কৃষ্ণমোহন। ঐদিনই ডিয়ালট্রি মধুসূদনের নতুন নামকরণ করেন 'মাইকেল'। দেবদূত মাইকেলের নামানুসারে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৫১ সালের ১০ জুলাই। খৃষ্টধর্ম

গ্রহণের পর তিনি কৃষ্ণমোহনের প্রথমা কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। এ ঘটনা বাংলাদেশে রীতিমত একটি তুফান তোলে। প্রসন্নকুমার জ্ঞানেন্দ্র মোহনকে ত্যাজ্যপুত্র করে ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। এ ঘটনায় অনেক রহস্যপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর'ও রঙ্গ করতে ছাড়েনি। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনন্যকরণীয় ভঙ্গিতে লিখলেন—'জ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানেন্দ্রবাবু জ্ঞানদাতাদিগের অনুগ্রহে খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় যে চমৎকার জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, নিজ নতুন নিলয় হইতে যথারীতি-ক্রমে সাধারণকে সেই জ্ঞান বিতরণার্থ কয়েকদিবস বক্তৃতা করণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। দেখা যাউক, জ্ঞানেন্দ্রবাবু কি জ্ঞান দ্বারা আমার-দিগ্যে অজ্ঞান করিয়া তোলেন, তিনি যত জ্ঞান প্রকাশ করুন, তাহাতে লোকে হতজ্ঞান না হইলেই রক্ষা পাইব।'

জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে কিন্তু এ সব দৃষ্টান্তর বিচলিত করতে পারে নি। দেশের ওপর তাঁর অপরিসীম মমতা ছিল। তিনি একবার এক বক্তৃতায় বলেন—'আমি ব্রাহ্মণ খৃষ্টান।' শেষ জীবনে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু আইনের অধ্যাপক ছিলেন। একবার লেভিতে তাঁর কন্যার ভারতীয় পরিচ্ছদ দেখে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

ফরাসী সাহিত্যের অমর কবি তরু দত্ত খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৬২ সালে। তরু দত্তের পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্তও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি নিজেও কবি ছিলেন এবং হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহপাঠীদের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মধুসূদন কখনও কখনও আবেগে গোবিন্দচন্দ্রের হাত ধরে বলতেন—'উই টুইন দত্তজ আর দি ব্রাইট স্টরস অব হিন্দু কলেজ!' তরু দত্তের গৃহ-শিক্ষক শিবচন্দ্র ব্যানার্জীও গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন।

সূর্যকুমার চক্রবর্তী দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলেত গিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করেন। তাঁদের শিক্ষক ছিলেন ডাক্তার হেনরি গুডিভ। সূর্যকুমার হেনরি সাহেবের কন্যাকে বিয়ে করেন এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ডাঃ গুডিভ চক্রবর্তী লিখতেন।

সূর্যকুমারের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেনেডিকটাও বিদুষী মহিলা ছিলেন। 'গোবিন্দ সামন্ত' উপন্যাসের অমর স্রষ্টা লালবিহারী দে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি গুজরাট নিবাসী পার্শী খৃষ্টান রেভারেণ্ড হরমাদজি পেস্টনজির কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন।

প্রবাসী বাঙালি বীর কর্নেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন মাত্র তের বছর বয়সে। কলকাতার লণ্ডন মিশন কলেজের অধ্যক্ষ আস্টন সাহেব তাঁকে দীক্ষিত করেন। সুরেশচন্দ্র বহুভাষাবিদ ছিলেন। জাহাজে চাকরি নিয়ে তিনি বিলেত যান তারপর সেখান থেকে জার্মানী হয়ে ব্রেজিলে পৌঁছান। ব্রাজিলের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি কর্নেল পদে উন্নীত হন। সেখানেই বিবাহ হবার পর স্থায়ী বাসিন্দা হন।

এই সব বাঙালি মনীষীর ধর্মান্তরপর্ব নিয়ে, যত রসিকতা হোক না কেন তাঁরা কিন্তু এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর চিরকাল মমত্ব দেখিয়েছেন।

বাঙালি মনীষীদের নিয়ে রঙ্গ ব্যঙ্গ

সমাজে নতুন উল্লেখনীয় ঘটনা ঘটলে কেউ কেউ যেমন বিস্মিত হয়ে অভিনন্দন জানান, কেউ তেমনি মুগ্ধ হয়ে পুরোনোকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করেন। এ প্রবৃত্তি মানুষের আদিমকাল থেকেই আছে। প্রচলিত অর্থের এই সব অঘটন সমাজে যাঁরা ঘটান—সেই সব মনীষীরা বহু সময়েই তাই সম-সাময়িক সমাজে প্রশংসিত এবং নিন্দিত হয়েছেন। জীবিত অবস্থায় বহু মনীষীকে শুধুমাত্র রঙ্গ ব্যঙ্গের কুশীলব থেকেও জীবন কাটাতে হয়েছে। সব ক্ষেত্রে অবশ্য রঙ্গ ব্যঙ্গ অগৌরবের হয়নি। রঙ্গ বা ব্যঙ্গ তো লোকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বা ঘটনাকে নিয়েই করে। রঙ্গ ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু হয়েও পৃথিবীতে বহু মনীষী বা ঘটনা পাদপ্রদীপের সামনে এসেছেন—এ নজীরও বিরল নয়। ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার হাতে ইংলণ্ডের প্রথম পরাজয় নিয়ে ছাই-এর যুদ্ধ আজ আর ব্যঙ্গের পর্যায়ে পড়ে না। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির যখন কোন বই বিক্রি হত না, তখন এক পাঠিকার তাঁর 'টেম অব দি ডার্কভিল' উপন্যাস খানি পুড়িয়ে তার ছাই উপহার পাঠানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে হার্ডি রাতারাতি বিখ্যাত হন।

এই সব রঙ্গ-রসিকতার উৎসস্থল প্রধানত আবেগ। বাঙালীও আবেগ-প্রবণ জাতি, তাই স্বভাবতই বাঙালী মনীষীদের মধ্যে অনেকেই এই সব রঙ্গ ব্যঙ্গের শিকার হয়েছেন। এসব রঙ্গ-রসিকতা কখনও শুধু রসিকতা, কখনও ব্যজস্তুতি কখনও বা আক্রমণাত্মক বাক্যবাণেও পরিণত হয়েছে।

রামমোহন থেকেই শুরু করা যাক। রক্ষণশীল সমস্ত হিন্দু সমাজটার বিরুদ্ধে যিনি একা কুঠারাঘাত করেছিলেন তাঁর নামে সবচেয়ে প্রচারিত যে ছড়াটি, সেটি হল—

সুরাই মেলের কুল
ব্যাটার বাড়ি খানাকুল
বেটা সর্বনাশের মূল
ব্যাটার জাত বোষ্টম কুল

ওঁ তৎসৎ বলে ব্যাটা
বানিয়েছে ইস্কুল
ও সে জাতের দফা করলে রফা
মজালে তিনকুল।

সম্ভবতঃ এ গান রচনা করেছিলেন রামমোহনের প্রতিপক্ষ রাধাকান্ত দেবের দল। ব্রাহ্মসমাজও কিছু কম যান নি। তাঁরা রাধাকান্তের নাম দিয়েছিলেন —'গাধাকান্ত'।

বিধবা বিবাহ প্রচলনকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগর সমাজে এত নিন্দিত এবং আক্রান্ত হয়েছিলেন যে সেটা অবশ্য রঙ্গ ব্যঙ্গের পর্যায়ে পড়ে না। তবু তার মাঝে রঙ্গও যে ছিল না, তা নয়! তাঁর নামে প্রচলিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখনীয় গান হল—

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে
মনের সুখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে ভাই
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে॥

শুধু ছড়া গান নয়, শান্তিপুরে 'বিদ্যেসাগর পেড়ে' শাড়িও উঠেছিল। এই সময় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গ ব্যঙ্গের আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। বিদ্যাসাগর একদিন তাঁকে ডেকে বলেন—'ইন্দির, তুই ত আমাকে নিয়ে কোনও রঙ্গ করলি না! আমি এর কারণ বুঝতে পারি না।' ইন্দ্রনাথ উৎসাহিত না হয়ে পরাশর সংহিতার যে শ্লোকটি নির্ভর করে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেই শ্লোকটি এবং পরে বোধোদয়ের ব্যঙ্গ প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর রচনা দুটি পড়ে ইন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। ইন্দ্রনাথ এ কথা শুনে বলেছিলেন—

এতদিনে আমার একটা রঙ্গ করা সার্থক হল!

দ্বারকানাথের মদ্যপান নিয়ে রচিত রূপচাঁদ পক্ষীর সুবিখ্যাত গানটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে! রূপচাঁদ লিখেছেন—

কি মজা আছেরে লাল জলে
জানে ঠাকুর কোম্পানী

মদের গুণাগুণ আমরা কি জানি
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।
বেলগাছিয়ার বাগানে হয়
ছুরি কাঁটার ঝনঝনি
খানা খাওয়ার কত মজা
আমরা তা কি জানি
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।

কালীপ্রসন্ন সিংহ যেমন সমাজকে খোঁচা দিয়েছিলেন, তাঁকেও তেমনি সমাজ ছাড়েনি। লোকে তাঁকে 'টিকি কাটা জমিদার' আখ্যা দিয়েছিল আর তাঁর সুবিখ্যাত বিদ্যোৎসাহিনী সভার নাম দিয়েছিল 'মদ্যোৎসাহিনী সভা'। ডিরোজিও শিষ্য শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের লোকে নাম দিয়েছিল 'এঞ্জু'। এই এঞ্জুদের নিয়ে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 'সমাচার দর্পণে' অনেক ব্যঙ্গকবিতা লেখেন।

'ইয়ং বেঙ্গল'দের মধ্যে সর্বাধিক আক্রান্ত হয়েছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদন দত্ত। মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকরণে রচিত জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' ব্যঙ্গাত্মক হলেও, কাব্যগুণসমন্বিত ছিল। মধুসূদন নিজেও এ কাব্য পড়ে হেসেছিলেন। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়েও কম রসিকতা হয়নি। লোকে তাঁর নামধাতুর অতিরিক্ত প্রয়োগকে ব্যঙ্গ করে বলত 'টেবিলিলা সূত্রধার কাঁঠালের কাঠে!' দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকের নিমচাঁদ চরিত্রটিকেও অনেকে মধুসূদনের ব্যঙ্গ বলে মনে করেন। দীনবন্ধু অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন নি। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দেন 'মধু কি কখনও নিম হয়?'

রবীন্দ্রনাথের কাব্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে যে ঝড় তুফান উঠেছিল, সেকথা সাহিত্যপাঠকের অজানা নয়। কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের 'মিঠেকড়া' কাব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। কবির নামেও একটি সুবিখ্যাত ছড়া ছিল—

থাক থাক থাক পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা
তোর বকবকানি ফকফকানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা

তাও ছাপালি—,' গ্রন্থ হল

নগদ মূল্য এক টাকা !

শুধু ছড়াগানই নয়, নাটকপ্রহসনেও বাঙালি মনীষীদের নিয়ে রঙ্গ ব্যঙ্গ কম হয়নি। দীনবন্ধুর নাটকে ভোঁতারাম ভাট চরিত্রটি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-কে কটাক্ষ করে রচিত। অমৃতলাল বসু তাঁর অনেক নাটকে বাঙালি মনীষীদের নিয়ে রঙ্গ ব্যঙ্গ করেছেন। 'কালাপানি' প্রহসনে ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যাল চরিত্রটি সুরেন্দ্র নাথের, 'অবতারের' বৈষ্ণব গয়ারামের চরিত্রটি শিশরকুমার ঘোষের এবং 'বন্দেমাতরম্' নাটকে রাজবাহাদুরের চরিত্রটি রাজা অসীমকৃষ্ণ দেবের এবং অদিতি চক্রবর্তী চরিত্রটি ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি সকৌতুক ইঙ্গিত। রসরাজ অমৃতলাল 'খাসদল' নাটকে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে, 'হীরকচূর্ণ' নাটকে কৃষ্ণদাস পালকে নিয়ে এবং 'বাহবা বাতিক' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন।

অন্যান্য প্রসঙ্গও ছিল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ উপলক্ষে ব্যঙ্গ-রচনা প্রকাশিত হয়। দেশপ্রেমিকরাও বাদ পড়েননি। চরমপন্থী দলের ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালের বিরুদ্ধ দলের পক্ষে যে সুবিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক ছড়াটি লেখেন, তা হল—

আত্মশক্তির পরিণাম

আপনি বাঁচলে বাপের নাম

চম্পটে চটপটে হয় পগারপারে চলে

ঐ গো ডিডি ধল্লে !

মনীষীদের নিত্যসঙ্গী

কবি রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র কবি ছিলেন না, একজন দ্রষ্টাও ছিলেন। তাই কাব্যে উপেক্ষিত চরিত্রগুলি তাঁর নজর এড়িয়ে যায় নি। কাব্য-উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির প্রকৃত চিত্রাঙ্কনে যে চরিত্রগুলি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে, তারাই অনালোচিত থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই সে-সমস্ত উপেক্ষিত চরিত্রগুলি নিয়ে সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

মনীষী-জীবন আলোচনা করলেও দেখা যায় তাঁদের কর্মবহুল বিরাট জীবনে ভৃত্য বা অনুচররাও এমন ভূমিকা নিয়েছে, যেটির মূল্য বড় কম নয়। প্রদীপে সলতেটাই জ্বলে, কিন্তু তার দীপশিখাটি অনির্বাণ রাখতে হলে তেল জোগাতে হয়। অথচ তেল নিজে জ্বলে না। মনীষী-জীবনে কর্মের শিখাটি অনির্বাণ রাখতে যে অফুরন্ত তেলের প্রয়োজন—সেই তেলে নানা উপাদানের মত গৃহ-ভৃত্যের ঐকান্তিক সহযোগিতাও একটি অংশ। রবীন্দ্রনাথের মত দ্রষ্টা হলে মনীষীদের জীবনীকাররা এই সব অজ্ঞাত অথচ একান্ত অনুচরদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় নিশ্চয়ই লিখতেন।

বার্ণার্ড শ' তাঁর বহু রচনা পড়ে শোনাতেন এক পাচিকাকে। পাচিকা ভাল না বললে শ' কখনও সেটি প্রকাশের জন্যে পাঠাতেন না। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শ' বলেন যে, জীবনে তিনি তাঁর পাচিকার মত এমন নির্মম সমালোচক কখনও পাননি। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একবার 'সার সত্যের আলোচনা' নামে একটি আলোচনা পড়ে শুনিয়েছিলেন তাঁর এক দাসীকে। দ্বিজেন্দ্রনাথের গৃহভৃত্য মুনীশ্বর শুধুমাত্র ভৃত্য ছিল না, সে ছিল তাঁর 'তত্ত্বাবধায়ক, পার্শ্বচর-ও সর্বক্ষণের সঙ্গী।' প্রিন্স দ্বারকানাথের প্রিয় ভৃত্য ছিল হুলি।

রামমোহনের দুই প্রিয় ভৃত্য রামহরি দাস ও রামরত্ন মুখোপাধ্যায় তাঁর জীবনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল। রামমোহন ব্রিস্টলে যাবার সময়েও এই দুজনকে সঙ্গে নিয়ে যান। বিদ্যাসাগর তাঁর ভৃত্য শ্রীরাম নাপিতের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর অনুগত ভৃত্য খোদাইকে আজীবন স্মরণ করেছেন। 'আত্মচরিতে' খোদাই-এর কথা লিখতে গিয়ে

বলেছেন—'আমার চাকরভাগ্য চিরকালই ভাল।' এই খোদাই-কে তিনি অমর করে গেছেন তাঁর 'মেজ বৌ' উপন্যাসে। খোদাই সম্পর্কে তিনি এক-স্থানে বলেছেন—'খোদাই-এর স্মৃতি আমার মনে পবিত্র প্রেমের উৎসস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।' বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্সও তাঁর অনুগত ভৃত্য জনকে অমর করে গেছেন তাঁর 'পিকুইক পেপারস' গ্রন্থে।

মাইকেল মধুসূদনের প্রিয় ভৃত্য ছিল মধু সিং। তাঁর অবস্থাবিপর্যয়ের সময় তিনি তাঁর সমস্ত দাসদাসীকে কোন-না-কোন কর্মে নিযুক্ত করেন। রমেশচন্দ্র দত্তের ভৃত্য ছিল যুধিষ্ঠির; যাকে তিনি আদর করে 'যোষ্টে' বলে ডাকতেন। প্যারীচরণ সরকারের ভৃত্য পবন, ভগিনী নিবেদিতার রামলাল এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর ভৃত্য সুরেনের কথা বহু প্রসঙ্গে বলেছেন।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ চাকরদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি তাদের বলতেন—'তোদের বাবা মা তোদের যে কত যত্ন করে তা জানি না; কিন্তু তাদের চেয়ে আমি তোদের কম যত্ন করি না, এ আমার বিশ্বাস।' মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁদের ভৃত্যদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভৃত্যদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন কন্যা শান্তা দেবী তা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—'ভৃত্যদের তিনি কখনও তিরস্কার করতেন না। ভৃত্যদেরও রামানন্দ গৃহের পরিজনের মত ভাল-বাসিতেন। এলাহাবাদে তাঁহার মাতাভিখ নামক একজন ভৃত্য ছিল, সে প্রয়োজন হইলে তাঁহার হাঁটিবার জন্য বুক পাতিয়া দিতে পারিত। তিনি ভৃত্যদের হুকুম করিতেন না, অনুরোধ করিতেন।' কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারেরও ভৃত্যদের প্রতি সখ্যভাব ছিল।

রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুগত ভৃত্য বনমালী রবীন্দ্রনাথের জীবনের অনেকটা অংশে ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিদিনের জীবনে খুঁটিনাটি সব কিছু কাজের গুরুত্বপূর্ণ ভার নিয়েছিল সে। একান্ত মনোযোগ এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গেই সে সমস্ত কাজ করেছে। তার গায়ের রং ছিল কুচকুচে কালো, সে নীলকে লীল বলতো বলে কবি তার নাম দিয়েছিলেন নীলমণি, ডাকতেন লীলমণি বলে। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে অভিনয়ের জন্যে কবি যে বশীকরণ নাটক লেখেন, তাতে তিনি বনমালীর জন্যেও একটি চরিত্র রচনা করেন। বনমালী সে চরিত্রে অভিনয়ও স্বাভাবিক করে। কবির 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় কেষ্ট-চরিত্র অঙ্কনের পিছনে যে বনমালীর কোন প্রভাব ছিল না,

তাই বা কে বলতে পারে। কবির মৃত্যুর পর দেশে ফিরে বনমালী রবীন্দ্রনাথের বই এবং ছবি নিয়ে একটি লাইব্রেরী করে কবিকে স্মরণ করে। নিজে লেখাপড়া না জানলেও কবির ওপর যে কী পরিমাণ শ্রদ্ধা ছিল তার এ থেকেই প্রমাণ হয়। বনমালী ছাড়া শান্তিনিকেতনের অন্য চাকররাও কবির স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় নি। শান্তিনিকেতনে একটি রীতি প্রচলিত ছিল—গান্ধীদিবসে আশ্রমের সব চাকরদের ছুটি দেওয়া হত এবং সেদিন তারা নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসে খাওয়াদাওয়া করত। সেদিন সমস্ত কাজ করতে হত ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষিকাদের।

ঠাকুরবাড়ির আর এক আত্মভোলা স্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথের দুই ভৃত্য ক্ষিতীশ এবং রাধুর কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। নিত্য সন্ধ্যায় ক্ষিতীশ অবনীন্দ্রনাথের পায়ে তেল দিতে দিতে সত্য মিথ্যা হাজার গল্প শোনাত। রূপকথার জাদুকর শিশুর মত এ সব গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন। রাধুর বিয়ের সময় আর্থিক অসঙ্গতির জন্যে অবনীন্দ্রনাথ কোন সাহায্য করতে পারেন নি। কোন উপায় না দেখে তিনি একটি ছবি আঁকেন। সেই চিত্রে রাধু পুকুরধারে ছিপ হাতে মাছ ধরছে। প্রদর্শনীতে এ ছবিটি বহুমূল্যে বিক্রি হয়। শিল্পী সমস্ত টাকা রাধুকে উপহার দেন। 'অবনীন্দ্র-চরিতম্' গ্রন্থে প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর এ নিয়ে বড় সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন—'কী চাকরই না ছিল সে সব জমানায়! চাকর চকচকে করে রাখে মনিবদের বিনয়, আর মনিবদের শ্রদ্ধা চকচকে করে রাখে চাকরদের হুঁশিয়ারী। তবেই না হয় চাকর।'

অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথের বাগানের শখ ছিল। একবার একটি প্রদর্শনীতে তাঁর টিউলিপ ফুলের জন্যে তিনি একটি সোনার মেডেল পান, গুণেন্দ্রনাথ সেই মেডেলটি তাঁর মালী ভাগবতকে দান করেন। গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যিকারের গুণগ্রাহী, আসল গুণীকে তাই তাঁর চিনতে ভুল হয় নি।

এ দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন ডাঃ স্যামুয়েল জনসন। খামখেয়ালী বিচিত্র মর্জির এই অবিস্মরণীয় পুরুষটির বহু কাজে সহায়তা করেছে তাঁর ভৃত্য ফ্রাঙ্ক। বর্ণবিদ্বেষের সেই দিনেও তিনি তাঁর নিগ্রো ভৃত্য ফ্রাঙ্ককে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতেন। মৃত্যুর পূর্বে জনসন তাঁর সম্পত্তিই প্রায় এই ভৃত্যকে দান করে যান। পরবর্তীকালে তাই ফ্রাঙ্ককে আর কখনও চাকরি করতে হয় নি।

ঐতিহাসিক গিবনের জীবনে তাঁর ভৃত্য জোসেফের অবদান অনস্বীকার্য। গিবন অত্যন্ত শ্রমকাতর এবং অলস প্রকৃতির ছিলেন বলে কোন রচনা সৃষ্টি করতে তাঁকে বেগ পেতে হত। তিনি জোসেফকে তাই রোজ তাঁকে ঘুম থেকে তুলে দিতে বলতেন। জোসেফ তুলে দিতে গেলে গিবন ঘুমের ঘোরে তাঁক মারতেন, তিরস্কারও করতেন। কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে আবার ধন্যবাদও জানাতেন। শিশুসুলভ এই মানুষটির প্রতি জোসেফের এমনি একটা মমতা ছিল যে, কখনও সে এসব কথা কানেই তোলেনি। গিবনকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্যে গণ-সম্বর্ধনার আয়োজন করা হলে গিবন নিজের গলার মালা খুলে জোসেফকে পরিয়ে দেন এবং সভায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন এই 'পুওর জোসেফ' না থাকলে তাঁর পক্ষে জীবনে কোনও কাজই করা হত না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর খানসামা মজফরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার হাতে সাজা তামাক না হলে তাঁর চলত না। এ জন্যে মজফর তাঁর নিত্য সহচর ছিল। দেশবন্ধুও তাঁর পিতার ন্যায় একজন জেলফেরৎ আসামীকে চাকর নিযুক্ত করেন। প্রসিদ্ধ স্রষ্টা ড্যানিয়েল ডিফো তাঁর নিত্য সহচর পিটারকেও এমনি স্নেহ করতেন। রবিনসন ক্রুশো রচনা করতে গিয়ে তাই তিনি পিটারকে বার বার স্মরণ করেছেন। 'ম্যান ফ্রাইডে' রূপে সে বার বার তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের দুই ভৃত্য হল ননী ও ভোলা। ভোলা তাঁর এক-রকম অভিভাবক ছিল। তার সঙ্গে পরামর্শ না করে শরৎচন্দ্র কখনও কোথাও যেতেন না। কোন গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ করতে গিয়েও তার সম্মতি নিতেন। শৈশবে মাতামহের গৃহে মুশাই নামে ভৃত্য শরৎচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল—পরবর্তী-কালে তিনি 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে 'ধর্মদাস' চরিত্রে তাকে অমর করেছেন।

মনীষী-জীবনে ভৃত্য অনুচরদের ভূমিকাটি নগণ্য হলেও বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুজীবন থেকে বহু উর্ধ্বে যাঁরা বিচরণ করেন—দৈনন্দিন জীবনে প্রাত্যহিক প্রতিটি কাজে তাঁদের বস্তুজগতে ফিরিয়ে আনার জন্যে এই সব কুশীলবদের একান্ত প্রয়োজন। বাস্তবজীবনে পদক্ষেপ করার এরাই হল মহাজীবনের দুটি পদ। মহাজীবনের পাশে পাশে থেকে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে যেভাবে এরা মনীষীদের সহায়তা করেছে, তাতে তাদের ভূমিকাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রদীপের সুতীব্র আলোকে তাদের কোন সময়েই দেখা যায় নি। তবে মনীষীরা প্রত্যেকেই যে এসব মানুষদের স্মরণ করেছেন—এদের জীবনে এটাই মস্ত বড় শ্লাঘার বস্তু!

মনীষীদের জীবজন্তু

মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে খাদ্যখাদক সম্পর্ক থাকলেও, মানুষ চিরকালই জীবজন্তুকে ভালবেসেছে। ভালবাসার বন্ধনে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তু বৈরিভাব ভুলে বহুকাল ধরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছে। ইতিহাস-সাহিত্য-চিত্রকলা এবং বেদপুরাণের তাই অনেকটা অংশ অধিকার করে আছে নানান জীবজন্তু।

দেবদেবীর বাহন হিসেবে বহু জীবজন্তুই আমাদের আকর্ষণ করেছে। দুর্গার সিংহ, দক্ষিণরায়ের বাঘ, বিশ্বকর্মার হাতী, সূর্যদেবের ঘোড়া, অগ্নিদেবের ছাগল, পবনদেবের হরিণ, মা ষষ্ঠীর বিড়াল, শীতলার গাধা, গণেশের ইঁদুর প্রভৃতিকে স্মরণে রাখার জন্যেই হয়ত এ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। দেব আরাধনার নানান উৎসবে এ সব জীবজন্তুকেও আমরা নানাভাবে সাজিয়ে আসছি। এ ছাড়া যুধিষ্ঠিরের স্বর্গযাত্রার কুকুর, কিংবা জন্মাষ্টমীর কালরাত্রির অভয়দাতা গৃধিনী—এরাও অমর হয়ে আছে। আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনেও এরা স্থান পেয়েছে। অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তি কিংবা রোমের রোমাস ও রোমিউলাস নামে নেকড়ে বাঘদুটিও অমর।

মানুষ তাই আস্তে আস্তে এ সব জীবজন্তুকে কাব্যে, শিল্পে অমর করে রেখেছে। শকুন্তলা এবং হরিণ, রাণা প্রতাপ এবং তাঁর 'চৈতক' ঘোড়া অথবা আলেকজাণ্ডার ও তাঁর কুকুর 'পেরিটাস' একাকার হয়ে আছে। ব্যবসায়ের প্রতীক হিসেবেও অনেক জীবজন্তু আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়েছে—বাঘ মার্কা কাগজ, ছাগলমার্কা উল, হাতিমার্কা কেরোসিন, গাভী-চিহ্নিত তেল-ঘি ইত্যাদি এ সবই আমাদের জীবজন্তুপ্রীতির নিদর্শন।

সাহিত্যে ও জীবজন্তুকে অমর করে রেখেছেন কত স্রষ্টা। কুকুর নিয়ে রচিত কোনান ডয়েলের 'দি হাউণ্ড অব ব্যাস্কারভিলস', ইতালির এলভিও বারলেত্তানির 'ল্যাম্বো' গ্রন্থ সুবিখ্যাত। গাধার কাহিনী নিয়ে স্টিভেনসনের 'ট্রাভেলস উইথ এ ডান্‌কী'ও বিখ্যাত। এ ছাড়া সাঙ্কো পাঞ্জার বিখ্যাত গাধা এবং ডন কুইকজোটের ঘোড়া 'রোজিনাণ্ড'ও সাহিত্যে অমর। রবিনহুডের কাহিনীর সঙ্গে হরিণ এবং আমাদের মহাকাব্যের পাতায় পাতায় ঘোড়া বহু-

বার উচ্চারিত। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' এবং পরশুরামের 'মতিলাল' গল্পে ষণ্ড, বনফুলের 'গণেশ-জননী' ও প্রভাতকুমারের 'আদরিণী' গল্পে হাতী অমর হয়ে আছে। ছড়াগানে পাখি-পক্ষী তো সোচ্চার!

মনীষীদের জীবনেও দেখা গেছে অস্বাভাবিক পশুপক্ষীপ্রীতি। নিউটন-স্কট-হিটলার-জনসন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথ-মানবেন্দ্রনাথ সকলেই জীবজন্তুর প্রতি অপরিসীম মমতা দেখিয়েছেন। জনসনের বাড়ি তো ছিল একটি চিড়িয়াখানা। কত জীবজন্তু যে ছিল সেখানে।

প্রথমে ধরা যাক কুকুরের কথা। নিউটনের বিখ্যাত কুকুর 'ডায়মণ্ডে'র কথা কে না জানে! হিটলারের একটি কুকুর ছিল, নাম ব্লন্ডি। হিটলার বলতেন—জীবনে আমার সঙ্গে সকলে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও, ব্লন্ডি কখনও করবে না। স্যার ওয়াল্টার স্কটের কুকুরের নাম ছিল 'মাইডা'। কুকুরটি মারা গেলে স্কট তার সমাধিনির্মাণ করেন তাঁর বিখ্যাত ট্রেজার হাউসের প্রবেশ-মুখে এবং তার নিচে কবিতা খোদাই করেন লাতিন ভাষায়। ইংরেজী অনুবাদও করেন স্কট নিজেই—

Beneath the Sculptured form
Which late you wore,
Sleep soundly maida, at your
master's door.

কবি রবীন্দ্রনাথ একটি দেশী কুকুরকে খুব ভালবাসতেন। আদর করে তার নাম দেন 'লালু'। এই লালুকে নিয়েই তিনি পরে কবিতা লেখেন—

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
করস্পর্শ দিয়ে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'ভেলু' নামে এক কুকুর তাঁর জীবনের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। ভেলুর শোবার জন্যে শরৎচন্দ্র একটি তক্তাপোষ করিয়ে ছিলেন, তাতে কার্পেট পাতা থাকত এবং ছোট একটি তাকিয়াও থাকত। ভেলি মারা যেতে শরৎচন্দ্র পুত্রবিয়োগব্যথা অনুভব করেন। যে সব শুভানুধ্যায়ী শরৎচন্দ্রকে সমবেদনা জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছিলেন—

ভেলির বিনাশ নাই,
ভেলি অবিনাশ।

ভেলিকে কখনো তিনি ভেলু বলতেন; কখনো ডাকতেন বংশীবদন। এর আগে তাঁর আর একটি কুকুর ছিল 'কানা' নামে। সে মারা যেতে শরৎচন্দ্র ইংরেজিতে একটি কবিতা রচনা করেন। তার প্রথমটা ছিল—

Poor Kana, thou art dead
Being long unfed !
No more ana gona !
Are there dreams to look at ?
Cams't thou see the Cat ?
A little bit fat !

একজন জীবনীকার মন্তব্য করেছেন যে কানার মৃত্যুর সময়ে তিনি 'দেবদাস' রচনা করেছিলেন বলে দেবদাস অত দুঃখের। কানা এবং ভেলিকে ভালবাসতে গিয়ে তিনি কুকুর জাতটাকেই ভালবেসে ফেলেছিলেন। একবার তিনি তাঁর ড্রাইভারকে বলেন—দেখো বাপু, কুকুর চাপা দিলে কিন্তু তোমার চাকরিটি যাবে! কুকুর ছাড়া শরৎচন্দ্রের 'বটু' নামে একটি পাখি এবং 'স্বামীজী' নামে একটি ছাগলও ছিল।

এ দিক থেকে সবচেয়ে ভাগ্যবান একটি কুকুর হল 'উইলিয়ম'। রাজা পঞ্চম জর্জ যখন নেলসন রণতরীতে নৌবাহিনীর মহড়া পরিদর্শন করছিলেন, তখন দেখেন একটি বুলডগ সেনাবাহিনীর পিছনে রাজকীয় ভঙ্গিতে যাচ্ছে। সম্রাট খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দেন। রাজকীয় রীতি অনুযায়ী এটা খুব সম্মান ও সৌভাগ্যের। লোকে তাই সে কুকুরটির নাম দেয় 'স্যার উইলিয়ম'!

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের বাবা গুণেন্দ্রনাথের কি রকম জীবজন্তুপ্রীতি ছিল সে কথা অবনীন্দ্রনাথ 'স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন। গুণেন্দ্রনাথ তাঁর 'গোলাপী' নামের হরিণ এবং 'কামিনী' নামের কুকুরকে কত না যত্ন করতেন! কামিনীর আদরযত্ন দেখে অবনীন্দ্রনাথ এমন কথা পর্যন্ত লিখেছেন—'বাড়ির ছেলে আমাদেরও অত আদর যত্ন হয় না, যত হয়, কামিনীর!' অবনীন্দ্রনাথ নিজেও একটি টিয়া পাখি পুষে নাম দিয়েছিলেন 'চঞ্চু'।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ বলতেন—'পৃথিবীতে তিনটি জিনিস আমি বড় ভালবাসি, সর্বপ্রথম বই, তারপর ফুল ও কুকুর।' রাঁচীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

ঠাকুরের শৈলাবাস শান্তিকুঞ্জে 'গঞ্জু' নামে একটি কুকুর ও 'রূপী' নামে একটি বানরী ছিল। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র একটি বানরীর বিয়েতে সেকালে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন! রাজা রামমোহন বিলাতযাত্রার সময় তাঁর পোষা গাভীটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের দুটি গাভী ছিল 'বুধী' ও 'সোমী' নামে, তারাও ভীষন আদর যত্ন পেত তাঁর কাছ থেকে।

কুকুর, গরু ছাড়া আর একটি প্রাণী ঘোড়া মনীষীদের অনেক আদরযত্ন পেয়েছে। প্রতাপের 'চৈতক', সিদ্ধার্থের 'কণ্টক' ছাড়াও অশোক, শিবাজী ও লক্ষ্মীবাঈ-এর ঘোড়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। আলেকজাণ্ডারের প্রিয় ঘোড়া 'বুসিফেলাস' পুত্রতুল্য ছিল। বুসিফেলাসের মৃত্যু হলে আলেকজাণ্ডার হিডাসপেস নদীর তীরে সমাধি রচনা করে একটি নগর স্থাপন করেন। নগরটির নাম দেন বুসিফেলিয়া! ভলটেয়ার ও হেমিংওয়েরও ঘোড়া ছিল। বাঙালী কবিদের মধ্যে মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও দিনেন্দ্রনাথের ঘোড়া ছিল। কবি তরু দত্তের দুটি বিখ্যাত ঘোড়ার নাম ছিল—'জ্যাঁ' ও 'জ্যাঁতিল'। এদের প্রসঙ্গ তাঁর বহু চিঠিপত্রে আছে।

বিড়াল অমর হয়ে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'তে 'জুজুরী' নামে একটি বিড়ালকে অমর করে রেখেছেন। তরু দত্তেরও একটি বিড়াল ছিল 'মাজ্রা' নামে। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রূপী' ও 'জুলচী' নামে দুটি বিড়ালের কথা স্মৃতিকথায় স্মরণ করেছেন। বিজ্ঞানী নিউটনের মত বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুরও 'কেনো'ও 'গদা' নামে দুটি বিড়াল ছিল।

কবি কাউপারের ছিল তিনটি খরগোস। তিনি আদর করে তাদের নাম রেখেছিলেন 'পুষ', 'বেস' ও 'টাইনি'। শিশুসাহিত্যের অমর স্রষ্টা উপেন্দ্রকিশোরের ছিল দুটি হাতি!

পাখির দিকেও অনেকের আকর্ষণ ছিল। বিদ্যাসাগর স্বহস্তে অনেক কাককে প্রতিদিন খাওয়াতেন। তারা নির্ভয়ে এসে খেয়ে যেত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাখিপ্রীতি কিংবদন্তীর মত। শান্তিনিকেতনে বনের বহু পাখি এসে তাঁর সঙ্গে খেত, তাঁর গায়ে বসত। তিনি কত না আদর করে তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীরও এমনি পাখির ওপর ভালবাসা ছিল।

মনীষীদের ভালবাসা পেয়ে যেমন অনেক জীবজন্তু ধন্য হয়েছে বিপরীত-

ভাবে তাঁদের ভীতিতেও অনেক জীবের নাম উচ্চারিত হয়েছে। অনেক স্রষ্টার ভয় ছিল কুকুরকে, কিন্তু এডগার এ্যালেন পো ভয় করতেন ইঁদুরকে। তিনি ইঁদুর-মারা বিষ টেবিলে না রেখে বসতে পারতেন না। রামেন্দ্রসুন্দর ভয় করতেন আরশোলা। আরশোলার নাম শুনলে তিনি ছোট ছেলের মত ভয়ে কুঁকড়ে যেতেন। আর একটি অবিশ্বাস্য সত্য হল—দোর্দণ্ড-প্রতাপ অকুতোভয় নেপোলিয়ন ভীষণ ভয় করতেন বিড়ালকে! বিড়ালের পক্ষে এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়!

অবিশ্বাস্য স্মৃতিশক্তি

মনোবিজ্ঞানে স্মৃতিশক্তিকে মানুষের একটি বিশিষ্ট গুণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে পূর্বপুরুষদের এই ঐশ্বরিক শক্তিটি না থাকলে যে বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছুই থাকত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। কাগজ-কলম যখন ছিল না, তখনও মানুষের রচনাশক্তি ছিল এবং এই স্মৃতিশক্তিই সে সব রচনার ধারক ও বাহক হয়ে এসেছে। আগে আমাদের দেশে অনেক শ্রুতিধর ছিলেন—তাঁদের কাছে আমরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য বহুলাংশে ঋণী।

ইতিহাসে দেখা যায় সমস্ত মনীষীই প্রায় এই শক্তির কমবেশি অধিকারী ছিলেন এবং সকলেই এ শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। মধুসূদন স্মৃতিশক্তিকে কত বড় মনে করতেন, তা তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে বন্ধুকে ডেকে 'ম্যাকবেথ' থেকে মুখস্থ বলার চেষ্টার মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। মনীষী-জীবন আলোচনা করলে এই সব অবিশ্বাস্য স্মৃতিশক্তির কথা জানা যায়।

শঙ্করাচার্য যখন মাত্র এক বছরের শিশু, তখন তিনি মাতৃভাষা শিক্ষা করেন। দু বছর বয়সে তিনি মায়ের মুখ থেকে শুনে পুরাণাদি কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। এসব তথ্যের সম্ভাব্যতা জন্মান্তরবাদীদের আগ্রহী করে তুলবে, সন্দেহ নেই।

ইংরেজি সাহিত্যের অবিস্মরণীয় স্রষ্টা জনসন ছেলেবেলা থেকেই যে কত স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। জনসন যখন সবেমাত্র পড়াশোনা করতে শিখেছেন, তখন একদিন তাঁর মা তাঁকে একটি প্রার্থনাপুস্তক মুখস্থ করতে দিয়ে উপরে উঠে যান। মা যাবার সঙ্গে সঙ্গে বালক জনসন মাকে গিয়ে বলেন মুখস্থ হয়ে গেছে। পরীক্ষা নেবার সময় মা অবাক বিস্ময়ে জনসনকে ক'বার পড়েছে জিজ্ঞেস করেন। বালক জনসন জবাব দেন—একবার।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও ভীষণ মুখস্থ করতে পারতেন। তাঁর মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণটি আদ্যোপান্ত অর্থসহ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। সময় লেগেছিল মাত্র দেড় মাস।

'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এই শক্তি সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। একবার এক ভোজসভায় তাঁর সঙ্গে প্যারীচাঁদ মিত্রের তর্ক হয়। প্যারীচাঁদ মেকলের রচনার প্রশংসা করেন, হরিশচন্দ্র গিবনের। নিজের মত প্রমাণ করতে গিয়ে হরিশচন্দ্র গিবনের রচনার সমস্ত উল্লেখযোগ্য অংশ অনর্গল আবৃত্তি করেন।

নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের এই শক্তি সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনে কাশী থেকে দুজন পণ্ডিত তাঁর কাছে তর্কযুদ্ধের পরীক্ষায় আসেন। বিনয়াবনত নিমাই পণ্ডিত তাঁদের বলেন—তিনি জ্ঞান-গরিমায় অনেক পিছনে, তবে তাঁরা যদি কাব্য শোনান, তাহলে তিনি শুনে ধন্য হন। আত্মগর্বে গরীয়ান দুই পণ্ডিত প্রায় সাত আট ঘণ্টা কাব্য শোনান। তাঁরাও পাণ্ডিত্য বা স্মৃতিশক্তিতে কিছু কম ছিলেন না। কিন্তু মতামত জিজ্ঞেস করলে নিমাই পণ্ডিত শেষকালে তাঁদের সাত আট ঘণ্টা কাব্যপাঠ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মতামত জানান। একবারমাত্র শুনেই তাঁর সমস্ত কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননেরও স্মৃতিশক্তি ছিল অপরিসীম। তিনি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের আদ্যোপান্ত মুখস্থ বলতে পারতেন। তাঁর গরীয়সী স্মৃতিশক্তির একটি কাহিনী উল্লেখনীয়। পণ্ডিত একদিন ত্রিবেণীর ঘাটে বসে আহ্নিক করছিলেন। সে সময় বজরায় চেপে দুজন ইংরেজের আগমন হয়। তাঁরা দুজনে ভীষণ তর্ক এবং মারামারি করছিলেন। তারপর একজন আদালতে নালিশ করেন। মীমাংসার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন হয়। বিচারক অন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নাম জানতে চান। শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতের ডাক পড়ে। কোর্টে গিয়ে পণ্ডিত সবিনয়ে বলেন—তিনি ইংরেজি জানেন না, তবে তাঁদের উভয়ের কথোপকথনটি বলতে পারেন। বিচারকের নির্দেশে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন আদালতে দুটি ইংরেজের বিবাদের আদ্যোপান্ত মুখস্থ বলেন। অথচ সত্যিসত্যিই তিনি ইংরেজি জানতেন না। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির স্মৃতিশক্তিও এমন ছিল। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল বহুস্থানে বলেছেন—'সংস্কৃত-ভাষায় এমন কোন গ্রন্থ নাই যা তারানাথ তর্কবাচস্পতির কণ্ঠস্থ নয়।'

স্বামী বিবেকানন্দ একটি গ্রন্থ একবারমাত্র পাঠ করলে মুখস্থ বলতে পারতেন। প্যারীচরণ সরকার চসার থেকে শুরু করে সমস্ত ইংরেজ কবির

সুপাঠ্য কবিতা মুখস্থ বলতে পারতেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ শব্দ-সম্পদশালী বহু ইংরেজ লেখকের গ্রন্থ থেকে অনর্গল আবৃত্তি করতেন। স্যার আশুতোষ জীবনে একবার যা শুনতেন, জীবনে তা ভুলতেন না। আচার্য হরিনাথ দে শুধু উনত্রিশটি ভাষাই জানতেন না, একবার পড়লেই কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। মাইকেল মধুসূদন প্রাচীন ও আধুনিক বাইবেল মুখস্থ বলতে পারতেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের কণ্ঠস্থ ছিল উপনিষৎ, গীতা ও ভাগবত। স্যার গুরুদাসের সমস্ত অমরকোষ গ্রন্থটি মুখস্থ ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় সমগ্র রঘুবংশ কাব্যখানি কণ্ঠস্থ করেন। রজনীকান্ত সেন, বালক বয়সে রামায়ণ মহাভারতের অনেক অংশ মুখস্থ বলতে পারতেন। বাগ্মী লালমোহন ঘোষের শেক্‌সপীয়র মিল্টন প্রভৃতি কবি ছাড়াও মেঘনাদবধ কাব্যটি কণ্ঠস্থ ছিল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং অক্ষয়কুমার দত্তের প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল।

লর্ড মেকলে বাজি রেখে একরাত্রে মিল্টনের বিরাট প্যারাডাইস লস্ট কাব্যখানি মুখস্থ করে ফেলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়েরও এই কাব্যখানি মুখস্থ ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলা সাহিত্যের বহু অংশ মুখস্থ বলতে পারতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থখানি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আবুল কালাম আজাদ সমস্ত কোরাণ গ্রন্থটি মুখস্থ বলতে পারতেন। বলতে তাঁর পুরো তিন দিন সময় লাগত। জুলিয়াস সীজার তাঁর বিরাট সেনা-বাহিনীর প্রতিটি সৈনিকের নাম জানতেন। মার্কিন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অ্যাসা গ্রে পঁচিশ হাজার গাছপালার নাম মুখস্থ বলতে পারতেন।

নিজের সমস্ত রচনা মুখস্থ বলতে পারতেন অনেক স্রষ্টা। লর্ড বায়রন তাঁর সমস্ত কবিতা মুখস্থ বলতে পারতেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলালেরও নিজের সমস্ত কবিতা, এমনকি তাঁর ইংরেজি কাব্য Lyrics of Ind পর্যন্ত মুখস্থ ছিল। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসটিকে যে শুধু তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেই মনে করতেন তা নয়, কৃষ্ণকান্তের উইলের সমস্ত অংশ তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন। সাহিত্যসম্রাটের এই শক্তি বাল্যকাল থেকেই প্রখর ছিল। পাঁচ বছর বয়সে তিনি একদিনে অ আ ক খ শিখে ফেলেছিলেন। বঙ্কিম জীবনীকার শচীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—" 'অলস' 'অবশ' তুল্য বাক্যাবলী শিক্ষা করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুই এক দণ্ড মাত্র লাগিয়াছিল। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র নাকি তৎকালে গুরু মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'অলস'

'অবশ' পড়িলেই 'বশম' 'পশম' পড়া হইল, পাতা উল্টাইয়া যান। গুরু মহাশয় 'গীত' 'কীট' আরম্ভ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তৎতুল্য কথাগুলি মুহূর্ত মধ্যে শিক্ষা করিয়া নূতন কিছু শিখিতে চাহিলেন। গুরু মহাশয় সাতিশয় ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়াছিলেন, বাবা, বঙ্কিম, এরূপভাবে পড়িয়া গেলে আর কতদিন তোমায় পড়াইব!" বীরসিংহগ্রাম থেকে পদব্রজে কলকাতা আসার পথে বালক বিদ্যাসাগরও এমনি একবার মাত্র দেখেই ইংরেজি সংখ্যা চিনেছিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষও হাতেখড়ির দিন একবার দেখে বর্ণমালা শিখে ফেলেন!

বিশ্বখ্যাত কেরানী

কেরানী পদে দায়িত্ব যতটা, মর্যাদা সে তুলনায় অনেক কম। ব্রিটিশ আমল থেকে কেরানীদের বাবু বলা হত। বিদেশী শাসনকর্তারা কেরানীদের লেখা ইংরেজিকে তাচ্ছিল্য ভরে নাম দিয়েছিলেন 'বাবু ইংলিশ'। কিন্তু পৃথিবীতে বহু মনীষী কেরানী হিসেবে জীবন শুরু করে পরবর্তীকালে উন্নতি করেছিলেন। সেদিক থেকে মনীষীদের সংস্পর্শে এসে পদটিও ধন্য হয়েছে।

ইংরেজি সাহিত্যের বিস্ময়কর স্রষ্টা চার্লস ল্যাম কেরানী ছিলেন। তাঁর কেরানী জীবনের ওপর লেখাগুলি ইংরেজি সাহিত্যের গৌরব। নাট্যকার বার্নাড শ প্রথম জীবনে ডাবলিনের ইউনিয়াক টাউনসেণ্ড কোম্পানীর কেরানী ছিলেন। শ' নিজে এ পদের নামকরণ করেছেন 'জুনিয়র ক্লার্ক'। সারাজীবন তিনি কেরানী জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ভুলতে পারেন নি। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ইম্‌ম্যাচুরিটি'র নায়ক মিথের মুখে হয়তো তাই তার নিজেরই ধিক্কার প্রতিধ্বনিত হয়েছে—I wonder is there any profession in the world so contemptible as that of a clerck! বিশ্ববিখ্যাত কবি কাউপার 'হাউস অব কমন্স'-এ কেরানীর চাকরি করতেন।

লর্ড ক্লাইভ ১৭৪৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কেরানী ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতবর্ষে এসেছিলেন একজন কেরানী হিসাবে।

বাঙালী মনীষীদের মধ্যেও অনেকে জীবন শুরু করেন এইভাবে। রামমোহন ১৮০০ থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর কালেক্টারের দেওয়ান ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের একজন কেরানী। মাইকেল মধুসূদন ছিলেন কলকাতা পুলিশ আদালতের হেড ক্লার্ক। সে সময় তাঁর মাসিক বেতন ছিল মাত্র ১২০ টাকা। মধুসূদনের 'বস্' ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। মধুসূদনের আগে ঐ পদে কাজ করতেন পরবর্তীকালের খ্যাতনামা জজ দ্বারকানাথ মিত্র।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেন প্রথম জীবনে কেরানী ছিলেন। কেশবচন্দ্র নিজেও জীবন শুরু করেন একজন সামান্য কেরানী হিসাবে। তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে (বর্তমান স্টেট ব্যাঙ্ক) কাজ করতেন। বেতন

ছিল মাত্র কুড়ি টাকা। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র জীবন শুরু করেন কেরানী হিসাবে। বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও প্রথম জীবনে কেরানী ছিলেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্রও প্রথম জীবনে নীলকর অফিসের একজন কেরানী ছিলেন। মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু জীবন শুরু করেন কারেল এণ্ড কোম্পানীর কেরানী হিসাবে কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারী চাকরিতে এসে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কণ্ট্রোলার জেনারেল পদে উন্নীত হন।

রামবাগানের দত্ত বংশের সুবিখ্যাত নীলমণি দত্ত নবকৃষ্ণ দেবের কাছে কেরানীর কাজ করতেন। এই নীলমণি দত্তের পুত্র হলেন সুবিখ্যাত রসময় দত্ত এবং কবি তরু দত্ত হলেন তাঁর পৌত্রী। বিখ্যাত কবি নবকৃষ্ণ ঘোষ সামান্য কেরানী হিসাবে জীবন শুরু করে পরবর্তী জীবনে এ-জি-বি'র সহকারী পদে উন্নীত হন। ইনি 'রামশর্মা' ছদ্মনামে ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম বাঙালি সভাপতি ডবলু সি বোনার্জী এটর্নী অফিসের কেরানী ছিলেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার বিশ্ববিখ্যাত সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় টলা এণ্ড কোম্পানীর একজন কেরানী ছিলেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল মাত্র বারো টাকা। পরে ১৮৪৯ সালে তিনি মিলিটারী অডিটর জেনারেলের অফিসে কেরানী পদে যোগদান করেন। বেতন পেতেন মাসে পঁচিশ টাকা। উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জীবন-যাত্রা শুরু করেছিলেন একজন সাধারণ কেরানী হিসাবে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটারের পদে বসান স্বয়ং বিদ্যাসাগর। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু দেরাদুন ফরেস্ট অফিসারের কেরানী ছিলেন। বাঘা যতীন ছিলেন একজন স্টেনোগ্রাফার।

মনীষী জীবন পাঠ করলে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, জীবনই আসল লক্ষ্য। জীবিকা যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন, জীবনকে বৃহৎ ও মহৎ করার পথে কোন বাধাই সে সৃষ্টি করে না!

খ্যাতির বিড়ম্বনা

বাণিজ্যে যেমন লক্ষ্মীর আগমন হয় অকস্মাৎ—সাহিত্যস্রষ্টার জীবনেও তেমনি খ্যাতি আসে হঠাৎ। যিনি অজস্র রচনা করেও অখ্যাত ছিলেন, তাঁকেই হয়তো পৃথিবীবাসী চিনেছে একটি ছোট্ট রচনায়। কেউ মাত্র একটি রচনাতেই অমর হয়ে আছেন। ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনে লোপ-ডি-ভেগা নামে একজন নাট্যকার ছিলেন। তিনি মোট ২২০০ নাটক লিখেছিলেন। তাঁর কবিতার পংক্তি সংখ্যা ছিল ২১,৩০০,০০০। আমাদের মহাভারতের দশ গুণেরও বেশি। এ ছাড়া তাঁর অন্য রচনাও ছিল। কিন্তু ভেগার এই বিশাল রচনার পাশে বেঁচে আছেন তাঁরই দেশের এক স্রষ্টা সার্ভেন্টিস যাঁর প্রধান রচনা একটি 'ডন কুইকজোট'।

কারও জীবনে জীবিত অবস্থায় খ্যাতি আসে নি। কারও জীবনে খ্যাতি এসেছে অসতর্কভাবে। কেউ জীবনে খ্যাতির জন্য হাহাকার করেও সেই খ্যাতি পেয়েছেন মৃত্যুর পরে। কোন কোন ভাগ্যবানের ক্ষেত্রে খ্যাতির আধিক্য স্রষ্টার জীবনে বিড়ম্বনা এনেছে। বিশ্ব সাহিত্যের স্রষ্টাদের জীবনে খ্যাতির বিড়ম্বনার এসব কাহিনী শুধু সংখ্যাতেই অধিক নয়, বৈচিত্র্যেও অনন্য।

কবি বায়রনের জীবনে খ্যাতি এসেছে একদিনে। নিতান্ত আকস্মিক ভাবে। ১৮১২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী বায়রনের 'চাইল্ড হ্যারোল্ডে'র দুটি স্তবক প্রকাশিত হয়। এ কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শহরে যেন ঝড় শুরু হয়। এক মাসের মধ্যে কবিতাটি সাতটি সংস্করণে অজস্র কপি বিক্রি হয়। বায়রন নিজে এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে লিখেছেন—I woke one morning and found myself famous !

মহাকবি কীটসের জীবনে খ্যাতির বিড়ম্বনাই তাঁর অন্ধকার ঘনিয়ে এনেছিল। তাঁর 'এনডিমিয়ন'-এর অবিক্রীত সংখ্যাগুলি প্রকাশকের ঘরে দীর্ঘকাল পড়ে থাকে। তারপর প্রকাশক এগুলি পুরোনো বই হিসেবে নাম-মাত্র মূল্যে বিলিয়ে দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এনডিমিয়নের একখানি কপি দু হাজার পাউণ্ড মূল্যে বিক্রি হয়েছিল। রোমে রোগগ্রস্ত অবস্থায় কবি যখন শিল্পীবন্ধু সোভার্নের কোলে দেহ রেখেছিলেন—তখন তাঁর চোখে শুধু স্বপ্ন

ছিল খ্যাতির! কিন্তু জীবিত অবস্থায় তিনি সেটি পান নি। কবিবন্ধু লে-হাণ্ট তাঁর সাহিত্যকৃতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে জগতের সামনে তুলে না ধরলে হয়তো কীটস আজও অজ্ঞাতই থাকতেন।

ফরাসী ঔপন্যাসিক স্তাঁধালও জগতে পরিচিত হন তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। জীবিত অবস্থায় যিনি কোন স্বীকৃতিই পান নি, মৃত্যুর পর তিনিই উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ তিনজন ঔপন্যাসিকের মধ্যে একজন রূপে সম্মানিত হন। ইপলিৎ তেন (Hippolyte Taine) নামে একজন গবেষক স্তাঁধালের উপন্যাস নিয়ে একটি আলোচনা প্রকাশ করেন, সেই আলোচনা পড়ার পর স্তাঁধালের উপন্যাস লোকে পড়তে শুরু করেন। অথচ স্তাঁধালের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় মাত্র তিনজন লোক উপস্থিত ছিলেন!

কবি ভলতেয়ার বিখ্যাত এবং ধনী হয়েছিলেন মাত্র একটি কবিতা লিখে। চতুর্থ হেনরীর ওপর তিনি 'হেনরী এড' নামে যে কবিতা রচনা করেন, সেটি উৎসর্গ করেন রানী ক্যারোলিনকে। কবিতাটি এত জনপ্রিয় হয় যে, ভলতেয়ার একটি সংস্করণ থেকে হাজার হাজার পাউণ্ড মূল্য পান। খ্যাতির কথা তো বলাই বাহুল্য!

টমাস হার্ডির উপন্যাস বেশি বিক্রি হত না। তাঁর 'টেম অব দি ডার্কভিল' উপন্যাস পাঠ করে এক পাঠিকা বইখানি পুড়িয়ে কিছুটা ছাই খামে ভর্তি করে পাঠিয়ে দেন হার্ডির কাছে। এ ঘটনা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বই বিক্রী হতে থাকে। সমারসেট মম এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একখানি উপন্যাস লেখেন 'কেকস এণ্ড এল' নামে, অবশ্য হার্ডির নাম কোথাও দেন নি।

সমারসেট মমের নিজের জীবনেও বিড়ম্বনা কিছু কম ছিল না। তাঁর প্রথম রচনার পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘোরেন। তার পর ব্যর্থ হয়ে তিনি ফ্রান্সে যান ডাক্তারি করতে। যাবার আগে এক বন্ধুকে পাণ্ডুলিপিটি দান করে যান। ফ্রান্স থেকে কিছুদিন পরে ফিরে এসে দেখেন, বন্ধুকে দান করা পাণ্ডুলিপিটি শহরের অভিজাত মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে আর নাট্যকার হিসেবে তিনি ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছেন।

একই রকম অবস্থা হয়েছিল নুট হামসুনের। 'হাঙ্গারে'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘুরে তিনি শেষ পর্যন্ত হাজির হন 'কোপেনহেগেন পলিটিক্যাল' পত্রিকার সম্পাদক এডওয়ার্ড ব্রাণ্ডেস-এর

সামনে। ছেঁড়া জামা পরা হামসুনকে তিনি প্রথমে কোন আমলই দেননি, কিন্তু রাত্রে বইখানি পড়ে তখনই ছুটে যান বিখ্যাত প্রকাশক লুগুেগার্ডের বাড়ি। তারপরই প্রকাশিত হয় বিস্ময়কর উপন্যাসটি।

অপর দিকে ভাগ্য ভাল ছিল মার্গারেট মিচেলের। তাঁর 'গন উইথ দি উইণ্ড' প্রকাশের প্রথম দিনই পঞ্চাশ হাজার কপি বিক্রি হয়। তিন বছরে কুড়ি লক্ষ এবং তের বছরে আটত্রিশ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। পাঠক পাঠিকাদের কাছ থেকে রোজ হাজার হাজার চিঠি আসত বলে মিচেলকে শেষ পর্যন্ত দুজন সেক্রেটারী রাখতে হয়।

কবি ব্রাউনিং জীবনে খ্যাতি অর্জন করেছেন যতটা না কাব্য রচনা করে, তার চেয়ে বেশি এলিজাবেথ ব্যারেটকে বিয়ে করে। ব্রাউনিং তখন কবিতা রচনা করলেও কাব্য জগতে খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না। এলিজাবেথ তখন সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুন্দরী এবং কবি হিসেবে সুপরিচিতা ছিলেন। বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ব্রাউনিং রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন।

আজ যে রোবাইয়াৎ পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে—ওমর খৈয়ামের সেই রোবাইয়াৎগুলি হয়ত বা কীটদষ্ট স্তূপেই পরিণত হত। কিন্তু তা হতে দেয়নি এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এই গবেষক পারস্য-বাসী এই নাম-না-জানা মহাকবিকে জগতের সামনে তুলে ধরেন। পৃথিবীজুড়ে রসজ্ঞ পাঠক তাই মহাকবির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতাকেও স্মরণে রেখেছেন।

খ্যাতির বিড়ম্বনা অনেক স্রষ্টার জীবনে নির্মম পরিহাস রচনা করেছে। কবি চসারের কাব্যপাঠ করে প্রীত হয়ে ইংলণ্ডের রাজা ১৩৭৪ সালে কবিকে রাজকীয় ভাণ্ডার থেকে প্রতিদিন এক কলসী করে মদ মঞ্জুর করেন। চার্লস ডিকেন্সের আমেরিকায় এত গুণগ্রাহী ছিল যে, তাঁর আমেরিকাভ্রমণ কালে গুণগ্রাহীদের সঙ্গে করমর্দন করতে দু তিন ঘণ্টা সময় লাগে এবং শেষ পর্যন্ত ডিকেন্স অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিখ্যাত অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন লণ্ডন ভ্রমণকালে প্রথম তিন দিনে তিয়াত্তর হাজার চিঠি পড়েছিলেন। ন'জন মহিলা দাবী করেছিলেন যে চার্লিই তাঁদের নিখোঁজ ছেলে। আর খুড়ো, পিসি, নয়তো ভাই বোনের দাবীদার ছিলেন প্রায় সাতাশ জন!

ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের জীবনে খ্যাতির বিড়ম্বনা ছিল সর্বাধিক নির্মম। মলিয়েরের জেহাদ ছিল অন্যায়, অনাচার আর ভণ্ডামির বিরুদ্ধে।

অন্যায় দেখলেই তিনি রুখে দাঁড়াতেন। সমাজের সব স্তরের লোককেই তিনি কোন-না-কোন ভাবে আক্রমণ করেছেন। ফলে তাঁর শত্রুও হয়েছিল অনেক। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরে শবাধার বহন করার লোক পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে দেশবাসী মলিয়েরের গুরুত্ব অনুভব করতে পারেন। পারেন। জীবিত অবস্থায় যিনি ফ্রেঞ্চ একাডেমির সদস্য হতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, মৃত্যুর পর সেই মলিয়েরকেই দেশবাসী ফ্রেঞ্চ একাডেমির সদস্য নির্বাচিত করেন। এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা একশ জন। মলিয়েরের মর্মর মূর্তিকে একজন সদস্য ধরে বাকি নিরানব্বই জন সদস্য নির্বাচিত হন। খ্যাতির কি বিড়ম্বনা!

শেষ দৃশ্য

মহাকবি শেক্‌সপীয়র মানবজীবনকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তুলনাটি যে যথাযথ এবং অনবদ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দক্ষ বা অদক্ষ অভিনেতার মতই মানুষ তার সময়টুকু জীবন রঙ্গমঞ্চে কাটিয়ে পরদার আড়ালে সরে যায়।

অভিনয়ে কোন অভিনেতার শেষ সময়টুকু যেমন নাট্যরসের চরমে ওঠে, বিপরীতভাবে অনেক অভিনেতার আগমন ও প্রস্থান প্রায় 'লোকচক্ষু'র অন্তরালেই ঘটে। মানব জীবনেও মহাপুরুষদের জীবনের শেষ মুহূর্তটি অনেক ক্ষেত্রে যেমন নাট্যরস সমৃদ্ধ—অনেক ক্ষেত্রে তেমনি অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ। বিশ্ব ইতিহাসের এই সব মনীষীদের জীবনের শেষ মুহূর্তটি স্মরণ করলে কখনও কখনও যেমন অবাক লাগে, অনেক সময় তেমনি বিচিত্র মনে হয়!

সক্রেটিসের শেষ দিনটি বড় করুণ। কারাগারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী জানথিপে এবং একান্ত অনুগত শিষ্য প্লেটো, ক্রিটো এবং অন্যান্য বন্ধুরা। আবেগে উত্তেজনায় ভেঙে পড়ে জানথিপে বলে উঠলেন—'সক্রেটিস, তোমার সঙ্গে তোমার বন্ধুরা শেষবারের মত কথা বলতে এসেছেন!' জীবন মৃত্যু যাঁর পায়ের ভৃত্য, সেই মহান দার্শনিক শান্তভাবে প্লেটোকে বললেন—'ওকে নিয়ে যাও।' জানথিপেকে নিয়ে যাওয়া হল সেখান থেকে। দার্শনিক প্রবর সন্ধ্যায় স্নান সেরে এলেন, তারপর বসলেন। ক্রিটো একবার না বলে পারলেন না—অত তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই। সক্রেটিস মৃদু হেসে শিষ্যদের সঙ্গে মানুষের অবিনশ্বর আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তারপর বিষের কাপ হাতে তুলে নিলেন। প্রথমে একটু নিবেদন করলেন পরম পিতার কাছে তারপর বাকিটুকু পান করলেন। আবেগে উত্তেজনায় প্লেটো অধীর হয়ে বলে উঠলেন—'আমাদের সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু আজ বিদায় নিলেন!'

আর্কিমিডিসের শেষ মুহূর্তটি আরও করুণ। সারসিলাস একজন সৈনিককে পাঠালেন তাঁকে ডেকে। আনতে বিজ্ঞানী তখন গাণিতিক ছকে বিভোর। সৈনিক উদ্ধতকণ্ঠে সেকথা জানালে আর্কিমিডিস বলে উঠলেন—'যাও যাও

আমি এখন ব্যস্ত।' সৈনিকের চক্ষুদুটি রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। বৃদ্ধের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে সে আর একবার সেই অলংঘ্য আদেশের কথা জানাল। বিজ্ঞানীও সেই বিভোরভাবেই জবাব দিলেন—'আমার কাজ শেষ না হলে যেতে পারব না।' সৈনিক শেষবারের মত আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু সাধনায় মগ্ন সন্ন্যাসী সে কথায় ভ্রূক্ষেপই করলেন না। রোমীয় সৈনিকের তীক্ষ্ণ তরবারি ঝক ঝক করে ঝলসে উঠল একবার। তারপরই শেষ! শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর দ্বিখণ্ডিত দেহ লুটিয়ে পড়ল তাঁর অসম্পূর্ণ গাণিতিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার ওপর।

হত্যার বীভৎস পরিবেশের মধ্যেও কালের এইসব পুতুলদের শেষ দৃশ্যটি যে কত বিশিষ্ট ভাবতেও অবাক লাগে। জোন অব আর্ককে বুয়েন শহরে যেদিন আনা হল সেদিন ৩০শে মে, ১৪৩১ সাল। মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যে নগরবাসীদের সে কি বিরাট উল্লাস। মৃত্যুবাণ দেওয়া হল, তবু প্রকট যন্ত্রণার মাঝখানেও সে-কিশোরীর মুখে হাসি দেখা গেল। আর সেই সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে ঈশ্বর আরাধনা শোনা গেল।

'ইউটোপিয়া' গ্রন্থের বিস্ময়কর স্রষ্টা স্যার টমাস মুরকে যেদিন মৃত্যুদণ্ডের জন্য আনা হল সেদিনটা হল ৭ই জুলাই ১৫৩৫ সাল। সে দীপ্ত পৌরুষের গলায় মৃত্যুর মালা পরাতে বোধহয় টাওয়ার হিলের প্রহরীরও সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্তু মুর হাসতে হাসতে প্রহরীকে বললেন—'তোমার কাজ তুমি নির্ভয়ে কর।'

স্যর ওয়াল্টর র‍্যালের বধ্যমঞ্চের দিকে অগ্রসর হবার চিত্রটিও ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় চিত্র। দর্শকের মধ্যে একজনের মাথায় টুপি না থাকায় মৃত্যুপথযাত্রী র‍্যালে হাসতে হাসতে নিজের টুপি খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন। বললেন—'আমার চেয়ে আপনার প্রয়োজন অনেক বেশি'। তারপর গান গাইতে গাইতে তীক্ষ্ণ ব্লেডের তলায় তিনি মাথা রাখলেন।

অনেক মনীষীকে শেষ দিনে শিষ্য পরিবৃত অবস্থার বিভোর হয়ে থাকতে দেখা যায়, অনেককে ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতে। গ্যালিলিও যেদিন মারা যান সেদিন তিনি প্রিয়তম শিষ্য ভিভিআনি এবং টেরিছলিকে Impact of matters থিয়োরির অংশটুকু বলে যাচ্ছিলেন। তারই মধ্যে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুরকেও ১৮৯৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তাঁর

জীবনের শেষদিনে দেখা গেছে বন্ধু পরিবৃত হয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। একজন ছাত্র পাস্তরকে এক কাপ চা দিতে চাইলেন। মানব দেহে রোগ জীবাণুর বিভিন্ন ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্তা নিজের দেহের অবস্থাটাও হয়ত ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি হেসে বলে উঠলেন—'না না ওটার আর দরকার হবে না।' সত্যিই তাই হল। পাস্তরের জীবনের সেটাই হল শেষ কথা! ভলতেয়ারও শেষ মুহূর্তে বন্ধুদের কাছে মিনতি করে বলেছিলেন—'Do leave me to die in peace!' বন্ধুরা সচকিত হয়ে দেখেন সত্যি সত্যিই ভলতেয়ার আর নেই।

মহাকবি গ্যেটের মৃত্যুও কতকটা এই ধরনের। সেটা ১৮৩৮ সালের মার্চ মাস। ফাউস্ত প্রকাশিত হবার পর কবি তখন মুক্ত হৃদয়। কদিন অসুস্থতার পর একদিন কবি বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন সেটা কি মাস। ভৃত্য জবাব দিল—'মার্চ'। ভৃত্যের জবাব শুনে কবিও আনমনে একবার বলে উঠলেন—'আবার বসন্তকাল'। প্রায় সেই মুহূর্তেই কবি একটু অসুস্থতা বোধ করলেন, ভৃত্য ছুটে এল, নার্স এল। কবিকে ভালভাবে শুইয়ে দেওয়া হল। কবি অধীরভাবে সেই ঐতিহাসিক উক্তি করলেন—'জানলাগুলো খুলে দাও। আলো, আরো আলো আসুক!' কবি চোখ বুঝলেন। শেষ ঘুম।

আফ্রিকা আবিষ্কর্তা ডেভিড লিভিংস্টোনের মৃত্যু বড় বিস্ময়কর। প্রায় সিংহের গর্ভ থেকে যিনি ফিরে এসেছিলেন সেই লিভিংস্টোনের মৃত্যু কত না বিচিত্র। সেদিন ১৮৭৩ সালের ১লা মে। লিভিংস্টোন হাঁটু গেড়ে ঈশ্বর সাধনা করেছেন। সে সাধনা আর তাঁর কেউ ভাঙতে পারলে না। অল্পক্ষণ পরেই জানা গেল তিনি মৃত! ইংরেজি হরফের প্রথম মুদ্রাকর উইলিয়ম ব্যাক্সটন 'লাইভস অব দি ফাদারস' গ্রন্থ অনুবাদ করতে করতে প্রাণত্যাগ করেন।

কবি-শিল্পী ব্লেকের শেষ মুহূর্তটিও এমনি অবিস্মরণীয়। স্ত্রীর হাত থেকে কফির কাপ নিতে নিতে বললেন—'পলি তুমি আমার জীবনে একটি ধ্রুবতারা। দেবদূতের মত! মনের মত করে তোমার একটি ছবি আঁকব।' পলি স্থির হয়ে দাঁড়াল। আবেগে অধীর কবি তখনই তুলি তুলে নিলেন। কিন্তু ছবি আর শেষ হল না। অসমাপ্ত ছবির ওপর কবির জীবন সমাপ্ত হল। মনীষীরা হয়ত নিজেদের শেষ মুহূর্তটি বুঝতে পারেন, তাই ভুলচুক

সংশোধন করে যেতে চান। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর জীবনের শেষ দিনে গুরুভাইদের সঙ্গে একত্রে অন্নগ্রহণ করেছিলেন। আগে যেটা তিনি কখনও করেন নি।

আততায়ীর হাতেও অনেক মহান জীবনের শেষ হয়েছে। ব্রুটাসের হাতে নিহত জুলিয়াস সীজারের সেনেট হাউসে পম্পের মূর্তির নীচে তাঁর সেই শেষ কথা আজও পৃথিবীবাসীর মনে রোমাঞ্চ ও বিস্ময় সৃষ্টি করে—yet to Brute।

আমেরিকা মহাদেশের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রথম শহীদ প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের শেষ দিনটি যেমন নাটকীয় তেমনি করুণ। প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন তখন সিনেমা দেখছিলেন—এমনি সময় এক যুবক জরুরী বার্তার দাবী নিয়ে প্রেসিডেন্টের কানে কানে কথা বলার সুযোগ নিল। তারপর পিস্তলের আওয়াজ। রক্তে ভেসে গেল পাশাপাশি দর্শকদের কোটপ্যাণ্ট। পুলিশ তৎপর হবার আগেই যুবক পালান। একজন মহিলা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন—'আমাদের প্রেসিডেণ্টকে ও খুন করে গেল'।

হুনরাজ আর্টিলার মৃত্যু আরও করুণ। হুনরাজার সেদিন ইলডিকো নামে একটি সুন্দরী বালিকার পাণিগ্রহণের দিন। ষাট বছরের জীবনে নবতম মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। সুসজ্জিত কক্ষে দুজনে প্রবেশ করলেন। দ্বার বন্ধ করা হল। পরদিন সকালে পরিচারিকা দ্বারে করাঘাত করেও সাড়া না পেয়ে চিৎকার করলেন। শেষ পর্যন্ত সাড়া না পেয়ে দরজা ভাঙা হল। আর্টিলা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছেন। মৃত নায়কের পাশে ইলডিকো নির্বাক, নিস্পন্দ।

অপঘাতে মৃত্যুও অনেক মহান জীবনের সমাপ্তি টেনেছে। সেটা ১০৮৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় তারকা মহামতি উইলিয়ম সেদিন দুরন্ত ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন শহরের ভস্মস্তূপের ওপর। শত্রুপুরী জ্বালাতে গিয়ে তাঁর অঙ্গেই লাগল আগুনের হল্কা। অন্তিম সময়ে তখন তাঁর কাছে না-ছিল বন্ধুবান্ধব, না ছিল আত্মীয়স্বজন! মহাকাল এমনই নির্মম!

ট্রাফালগার নৌ-যুদ্ধের বিখ্যাত বীর নেলসন মারা যান তীর বিদ্ধ হয়ে। মৃত্যুর কিছু আগে ডাক্তার আশ্বাস দিচ্ছিলেন। কিন্তু নেলসন জানতেন সেটি তাঁর শেষ মুহূর্ত। তাই ক্যাপটেন হার্ডিকে ডেকে বললেন—'হার্ডি,

তুমি আমার স্ত্রীকে রক্ষা কোরো।' গ্রেট জেনারেলের দিকে তাকিয়ে হার্ডি অত্যন্ত সন্তর্পনে লেডী হ্যামিলটনের হাত ধরলেন। পরম শান্তিতে চোখ বুজলেন নেলসন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুও এমনি অপঘাত। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তিনি প্রাণ হারান। 'চারুপাঠে'র অমর গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন দীপ নির্বাপিত হয় গলায় সুপুরি আটকে।

মহাকবি শেলীর সৃষ্টি যেমন ছিল বিচিত্র জীবনও ছিল তেমনি। সর্বাপেক্ষা নাটকীয় হল তাঁর মৃত্যু। জীবনের শেষ মুহূর্তটি। সেটা ১৮২২ সালের জুন মাস। জেনোয়া শহরে কবি বন্ধু লে-হান্ট এসেছেন শুনে শেলী ছুটে এলেন দেখা করতে। সঙ্গে অন্য এক বন্ধু উইলিয়ম। দেখাসাক্ষাতের পর শেলী ফিরতে চাইলেন। কিন্তু সমুদ্রের ভীষণ অবস্থা দেখে শুভাকাঙ্ক্ষীরা নিষেধ করলেন। কিন্তু 'প্রমিথিউস আনবাউণ্ড' এর বিস্ময়কর স্রষ্টা সেসব তুচ্ছ করে রওনা হলেন। যাত্রার পর সন্ধ্যায় উঠল ঝড়। ···শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুমান সত্য হল। দশদিন পরে ভিয়া রিজিওর তীরে তোলা হল একটি দীর্ঘ দেহ। কোটের পকেটে পাওয়া গেল একখণ্ড সফোক্লিসের নাটক আর এক খণ্ড কীটসের কবিতাবলী। শতাব্দীর মহাকবিকে সনাক্ত করতে দেরী হল না। খবর পেয়ে ছুটে এলেন লে-হান্ট, বায়রন, আরো অনেকে। বায়রন সে-দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ছুটে পালালেন সেখান থেকে। অন্তরঙ্গ বন্ধু ট্রেলনে ছুটে এসে শেলীর হৃদপিণ্ডটা ছিনিয়ে নিলেন আগুনের হল্কা থেকে।

মহামতি টলস্টয়ের জীবনের শেষদিনটি যেমন বিচিত্র, তেমনি রোমাঞ্চকর। পারিবারিক কলহ থেকে দূরে থাকার জন্যে টলস্টয় সেদিন লুকিয়ে পালাচ্ছিলেন। কিন্তু রস্তোভ—অন—দন পৌঁছবার আগেই অক্‌টোপাভো স্টেশনে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। আস্তে আস্তে খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। রুশ দেশের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ভ্রূক্ষেপ না করেই দিগ-দিগন্ত থেকে গুণগ্রাহীরা এসে পড়লেন। উন্মাদ হয়ে স্ত্রী সোফিয়া এসে লুটিয়ে পড়লেন স্বামীর পদপ্রান্তে। স্বামীর সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ হল না, শুধু মৃত্যু পথযাত্রীর কণ্ঠ থেকে স্পষ্ট একটি বাণী শুনতে পেলেন তিনি—'To seek always to seek'। কিন্তু সত্যের সন্ধানে সে পথিক তখন বহুদূরে।

অনেক মহান জীবনে মৃত্যুর পথ আজও ধূমায়িত। বিশ্ববিজয়ী

আলেকজাণ্ডারকে ব্যাবিলনের রাজপ্রাসাদে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রবাদে আছে তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু অনেকের মতে তিনি আগুনে আত্মহত্যা করেছিলেন। ক্যাপ্টেন স্কটকে তাঁর শেষ সময়ে পাওয়া যায় নি। বহুদিন খোঁজার পর তাঁর দুই বন্ধু বোয়ার ও উইলসনের সঙ্গে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। যেন তিন বন্ধুতে ঘুমোচ্ছেন। রুশোর মৃত্যু আজও তমসাচ্ছন্ন। কেউ বলে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। কেউ এটা অস্বীকার করেন। প্রবল প্রতাপশালী ফরাসী বীর নেপোলিয়নের ক্ষেত্রেও এই রহস্য আছে। কেউ বলেন আফ্রিকার নির্জন দ্বীপ সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসিত থাকাকালীন তাঁর সাধের ফ্রান্সের কোন সংবাদ না পেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। কেউ আবার বলেন ক্যান্সারে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

মহান জীবনের এই সব নায়কদের জীবন যেমন নাটকীয় এবং কর্মবহুল ছিল—জীবনের পরিসমাপ্তিতে অন্তর্ধানও তেমনি বিচিত্র। জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ছাড়া আর কি! শেষ দৃশ্যটিও তাই এত নাট্যরসসমৃদ্ধ।

বিচিত্র সমাধিলিপি

চলতি কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। জীবিত অবস্থায় মানুষের নানান আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-অভিলাষ থাকে। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পরও মানুষের অনেক পারলৌকিক কামনা থাকে। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধশান্তি, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, শবযাত্রায় হরিনাম সংকীর্তন, খই-পয়সা ছড়ানো এসব তো আছেই। তার ওপর গয়ায় পিণ্ডদান পর্ব, গঙ্গার স্রোত-ধারায় নাভিনিক্ষেপ এসবও আছে। এ সমস্তই মানুষের পারলৌকিক কামনাকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা। মৃত্যুর পর আমরা যে প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার্থে দাতব্যচিকিৎসালয়, দেবালয়, স্কুল-কলেজ স্থাপন করি—এগুলির পিছনেও এই একই আকাঙ্ক্ষা!

পাশ্চাত্য দেশে এতপ্রকার ধর্মীয় ক্রিয়াপ্রক্রিয়া নেই। ওখানকার মানুষের তাই বলে যে কোন পারলৌকিক আকাঙ্ক্ষা নেই, এমন নয়। প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কবরে সমাহিত মানুষটিকে অমর করার জন্যে তাঁরা রচনা করেন সমাধিফলক। ইংরেজিতে যাকে এপিটাফ বলে তার অভিধানগত অর্থ যাই হোক—এসব সমাধিফলকে নানান লোকের নানান কথা লেখা হয়। হয়ত কেউ তাঁর এই সমাধিলিপি রচনা করে যান জীবিত অবস্থায়—যিনি পারেন না বা সময় পান না আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে—তাঁর সমাধিলিপি রচনা করেন মৃতের কোন শুভানুধ্যায়ী প্রিয়জন কিংবা কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিষাদের সুরে এসব লিপি যেমন কাব্যময়, তেমনি বিচিত্রধর্মী হয়। জীবিত অবস্থায় কালের যে-পুতুলটি ব্যস্ত থাকতেন নানান কাজে, মৃত্যুর পর সমাধিলিপিতে লেখা তাঁর জীবনকাহিনী এবং মানসিক চিন্তাধারার মূল সুরটি মূর্ছিত হতে থাকে যুগ-যুগান্তর ধরে। পরবর্তী কালের মানুষ এসব লিপি থেকে পান একটি লিখিত ইতিহাস। একটি বিষাদ-মিশ্রিত কাব্যরসের সন্ধান। নানা প্রকারে, নানা ভঙ্গিতে, নানারূপে এসব সমাধিলিপি মহাকালের সাক্ষী হয়ে থাকে।

এসব লিপিতে কোথাও মৃতের জন্ম-ইতিহাস লেখা হয়, কোথাও করা হয় নিছক প্রশংসা। কোথাও আবার তাঁর মানসচিন্তার নানান অভিজ্ঞান থাকে।

ইংরেজিতে প্রবাদ আছে—ম্যান ইজ নট অ্যাংরি উইথ দি ডেড; এজন্যেই বোধহয় মৃত্যুর পর সমাধিফলকে মৃতের অসৎ গুণের কথা লেখা হয় না। সৎ, অসৎ, ভালমন্দ সব নিয়েই তো মানুষ! কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষ তার মহৎ গুণের কথাই স্মরণ করে। মহাকালের কাছে সে বড় হয়েই থাকুক, অনাদিকালের মানুষ তাকে ভাল বলেই জানুক—সমকালীন মানুষ হয়ত এই কামনাই করে!

এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প আছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক চার্লস ল্যাম্ব ও মেরী ল্যাম্ব একবার এক সমাধিক্ষেত্রে বেড়াতে যান। প্রায় সমস্ত সমাধিলিপিগুলি পাঠ করার পর মেরীর বড় বিস্ময় লাগে—এতো সবই সৎ, দয়ালু ধর্মপ্রাণ লোকগুলির সমাধি। তিনি তখন আর ল্যাম্ব সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করে পারেন নি—ল্যাম্ব, এতো দেখছি সবই ভাল মানুষের কবর, মন্দ লোকের কবর কোথায়? ল্যাম্ব সাহেব হেসে মেরীকে বলেছিলেন—এখানে তারাও আছে। তবে মানুষ তাদের সব দোষ ক্ষমা করে মহান করেছে!

তাই দেখা যায় ইংরেজি ভাষার বিস্ময়কর প্রতিভা ডাঃ স্যামুয়েল জনসনও তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথের সমাধিস্তম্ভের ওপর ল্যাটিন ভাষায় লেখেন—'তিনি ছিলেন সুন্দরী, সংস্কৃতিসম্পন্না এবং বিশেষ ধর্মপ্রাণা মহিলা।' অথচ এলিজাবেথ যে সুন্দরী মোটেই ছিলেন না সেকথা জানা যায়।

মেকলে সাহেব পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—'প্রৌঢ়বয়স্কা এই মহিলা বেশবাসে ও আচার আচরণে অষ্টাদশী তরুণী সাজবার চেষ্টায় প্রায়ই হাস্যকর হয়ে উঠতেন।'

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যর আইজাক নিউটন মারা যান ১৭২৭ সালের ২০ মার্চ। তাঁকে ওয়েস্টমিনিষ্টার অ্যাবীতে সমাধিস্থ করা হয় ২৮ মার্চ। কিন্তু তাঁর সমাধিফলক নির্মাণ করা হয় চার বছর পরে ১৭৩১ সালে! কবি পোপ সমাধিলিপিতে লেখেন—

Nature, and natures laws lay hid in night;
God said : Let Newton be' and all was light.

দুটি লাইনে নিউটনের সমস্ত প্রতিভার পরিচয় রাখার এটি একটি উল্লেখনীয় নজীর!

গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস মারা যান ২১২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। তাঁর সমাধি স্তম্ভটি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দেড়শত বছর

পরে ৭৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে পরিব্রাজক সিসেরো সিসিলিদ্বীপে বুনো গাছ আর নানান আগাছার আড়াল থেকে শতাব্দীর বিস্ময়কর প্রতিভার স্মৃতিস্তম্ভটি খুঁজে বের করেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন—

"Thus would this most famous and once most learned city of Greece have remained a stranger to the tomb of-one of its most ingenious citizens, had it not been discovered by a man of Arpinum! আর্কিমিডিসের এই সমাধিফলকে কোন প্রশস্তিকা ছিল না। গোলক (sphere) এবং বেলনাকার (cylinder) পাত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের আবিষ্কর্তার সমাধিফলকেও একটি বেলনাকার পাত্রের মধ্যে একটি গোলক অঙ্কিত ছিল। অনাদিকালের মানুষের জন্যে এমন বিচিত্র সমাধিফলক রচনা না করলে হয়ত এমন স্বতন্ত্রভাবে এটিকে আবিষ্কার করাও সম্ভব হত না।

ক্যাপ্টেন কুকের সমাধিফলকেও এমনি বৈচিত্র্য ছিল। তাঁর সমাধিফলকে শুধুমাত্র একটি চতুষ্কোণ ছুঁচোল অস্ত্র চিহ্নিত আছে! লিপির চেয়ে অভিজ্ঞান যে এখানে অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য।

মহাকবি শেক্‌সপীয়রের স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ সমাধিলিপি তাঁর মহত্ব এবং বিশালত্ব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে—

In wisdom a Nestor,
In genius a Socrates,
In Art a Virgil,
The Earth shrouds him,
The Nation mourns him
Olympus guards him.

কবি এবং সাহিত্যসেবীরা স্রষ্টা বলেই হয়ত তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের সমাধিলিপি স্বতন্ত্রভাবে অথবা তাঁদের রচনার মধ্যে রেখে যান। কবি লে-হাণ্টের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির ওপর—তাঁর বিখ্যাত কবিতা আবু বেন আদেম-এর চতুর্দশ লাইনটি খোদাই করা হয়—Write me as one that loves his fellowmen. শেলী-কীটস-বায়রনের অকৃত্রিম বন্ধু এবং গুণগ্রাহীর চরিত্র বর্ণনা এর চেয়ে অল্পকথায় আর কি হতে পারে!

রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের সমাধির ওপরেও তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'রিকুইম' থেকে দুটি লাইন খোদাই করা হয়—

Home is the sailor, home from sea
And hunter home from the hill.

কবি কীটস এদিক থেকে অনেকটা সচেতন ছিলেন। রোমে শিল্পী-বন্ধু সেভার্নের সঙ্গে থাকার সময় তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন—তাঁর জীবনদীপ নিভে আসছে। মৃত্যুর অল্প আগে তাই তিনি নিজেই সেভার্নকে তাঁর সমাধিলিপি বলে যান—

Here lies one whose name was write in water.

রোগগ্রস্ত প্রতিষ্ঠাহীন কবি এছাড়া আর কি বলতে পারেন। শতাব্দীর মহাকবি অজ্ঞাতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। অত্যন্ত সাধারণভাবে নির্মাণ করা হল তাঁর সমাধি! কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যে এটি যে কত রমণীয় ছিল, সে বর্ণনা পরবর্তীকালে অস্কার ওয়াইল্ডের কাব্যে পাওয়া যায়—

The youngest of the Martyrs here is lain,
Fair as sebastian and as early slain
No eypress shades his grave, no funeral yew.
But gentle violets weeking with the dew
Weave on his bones an ever blossoming chain.

এর আগেই শেলীর হৃদয়বিদারক মৃত্যুকাহিনী বলা হয়েছে। শেলীর হৃদয়বিদারক মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিফলকে লেখা হল—

Nothing of him that both fade
But both suffer a sea-hange
Into something rich and strange.

কোন কবির সমাধিলিপিতে আছে তাঁর হৃদয়ের মূল স্বরের মূর্ছনা। কোন কবি কাব্যের মধ্যে তুলে ধরেন তাঁর জন্ম ইতিহাসের মূল বক্তব্যটুকু।

অনেক কবি-সাহিত্যিকের জীবনে দেখা গেছে তাঁরা এমন নিখুঁত বা যথাযথ সমাধিলিপি রচনাও করেন নি। মৃত্যুর পর কোন বিশেষ লিপির ওপর আগ্রহও দেখান নি। তবে তাঁদের মধ্যে অনেকে একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষার কথা বলে গেছেন।

কবি ভার্জিল জীবিত অবস্থায় দেশবাসীর অজস্র ভালবাসা পেয়েছিলেন বলেই হয়ত তিনি মৃত্যুর আগেই সমাধিস্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই নির্দেশ মত তাঁকে নেপল্‌সের পথিপার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়। চার্লস ডিকেন্স তাঁর শ্যালিকা মেরিকে ভীষণ ভালবাসতেন। সেই মেরির আকস্মিক

মৃত্যুর পর তিনি ডাইরিতে লেখেন 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমি যেন তাঁর সঙ্গে আবার মিলিত হতে পারি।'

ডিকেন্সের মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছামত তাঁকে ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবীতে মেরির কবরের পাশেই সমাধিস্থ করা হয়। লর্ড টেনিসনকেও তাঁর নির্দেশমত ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবীতে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রবার্ট ব্রাউনিংএর সমাধির পাশে শায়িত করা হয়।

মৃতের নিজস্ব সমাধিলিপি পাওয়া যায় না, গেলে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ শিষ্য বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই সমাধিলিপি রচনা করেন। কার্ল মার্ক্সের সমাধির ওপর এঙ্গেলস রচিত লিপি খোদাই করা হয়—

His name and works will live on through the countries.

ডিমোস্থিনিসের সমাধিলিপিও রচনা করেন তাঁর শিষ্য—

Didst thou to wisdom equal strength unite,

Then never Greece had bowed to conquering night.

হেমলক পানে সক্রেটিসের জীবনদীপ নির্বাপিত হলে অন্তরঙ্গ শিষ্য প্লেটো সমাধিলিপিতে অতি সাধারণ কথায় চমৎকার গুরু প্রশস্তি রচনা করেন—

This was the end of our friend, a man, as we may say, the best of all of his time that we have known, and moie over the most wise and just.

কবি কাউপারের দেহ ডেরিহাম গির্জায় সমাধিস্থ করার পর সমাধিলিপি রচনা করেন কবি বন্ধু হেইলি। যেমন চমৎকার সে লিপির বর্ণনা, তেমনি সুপরিস্ফুট তার বক্তব্য।

দ্বিতীয় চার্লস মারা যাবার পর তাঁর সমাধিলিপি লেখেন রোচেষ্টার। চার্লসের জীবনের কথা স্মরণ রেখেই রচয়িতা হয়ত সমাধিলিপি রচনা করেছিলেন। তাই সে-লিপিতে কিছুটা শ্লেষ, কিছুটা বিদ্রূপের রেশ পাওয়া যায়।

সত্যি কথাই, সমাধিলিপি রচনায় কবি রবার্ট বার্নস ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর রচিত সমাধিলিপি সংখ্যায় যেমন অসংখ্য, আঙ্গিক এবং বর্ণনায় তেমনি বিচিত্র! পোষা কুকুর—উকুন প্রভৃতি অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণীদের জন্যেও তিনি সমাধিলিপি রচনা করেন। কবি বন্ধু উইলিয়ম মিচির জন্য তিনি যে সমাধিলিপি রচনা করেন, সেটি একটি উল্লেখনীয় উদাহরণ—

Here lie Willie Michie's banes,
O Satan, when ye tak him,
Gle him the schulin' 'O' your weans'
For clever deils he'll mak them !

কবি কাউপার তাঁর বন্ধু চেস্টারের মৃত্যুর পর যে সমাধিলিপি রচনা করেন সেটিও বর্ণনা ভঙ্গিতে অপূর্ব। অস্কার ওয়াইল্ডের এপিটাফও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—

And alien tears will blil for him
Pity's long broken urn
For his mourners will be out-east men
And outcasts always mourn.

এতো গেল সব কীর্তিমানদের সমাধিলিপি : যাঁরা সকলের অগোচরে আসে, প্রায় সকলের অগোচরেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়—সেই সব অখ্যাত অজ্ঞাত লোকেদেরও কি সমাধিলিপি রচনা করা হয়েছে ? কবি গ্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতায় অনাদিকালের এই সব মানুষের জন্য সমাধিলিপি রচনা করে সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এ সমাধিলিপি কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, অনাদি-কালের অনন্ত মানুষের জন্য রচিত। তাই হয়ত বা এটি সমাধিস্তম্ভে খোদিত না হয়ে কাব্যে অমর হয়ে আছে—

Here rests his head upon the lap of Earth
A youth, to Fortune and to Fame unknown
Fair science frowne'd not on his humble birth
And Melancholy marked him for her own.

বাঙালি কবিদের মধ্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনই সমাধিলিপি রচনা করেন। তিনি সমাধিলিপির জন্য 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে' কবিতাটি একটুকরো কাগজে লিখে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দেন। কবি-কন্যা শর্মিষ্ঠা সেটি দেখতে পেয়ে সযত্নে তুলে রাখেন। তিনি এটি রক্ষা না করলে আমরা এই অনবদ্য সমাধিলিপিটি হারাতাম।

মধুসূদন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন। কিন্তু তাঁর সমাধিস্তম্ভ নির্মিত হয় অনেক পরে। আমেরিকান পাদ্রী ডল সাহেবের সমাধি নির্মাণ উপলক্ষে কলকাতায় ১৮৮০ সালে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাস্থ উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে সিটি কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র

দত্ত প্রমুখ ছিলেন। তাঁরা জানতে পারেন যে মধুসূদনের সমাধিস্থানে কোন স্মৃতিফলক নির্মিত হয় নি। তারপরই তাঁরা 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতিফলক নির্মাণ তহবিল' স্থাপন করে চাঁদা সংগ্রহ করতে থাকেন। প্রায় সাত বছর ধরে অর্থ সংগ্রহের পর কমিটির উদ্যোগে সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ সম্ভব হয়। ১৮৮৮ সালের ১ ডিসেম্বর মহাসমারোহে এই স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন কবির অকৃত্রিম বন্ধু ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি গৌরবের দিন। একটি কলঙ্ক মোচনের দিন। কবি মানকুমারী বসু তাঁর 'উচ্ছ্বাস' কবিতায় পিতৃব্য মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ উদ্বোধনের গুরুত্বটি চমৎকার বিবৃত করেছেন—

স্বভাবের শিশু, 'বঙ্গ কবিকুলেশ্বর'
বাল্মীকির প্রিয়ানুজা, বঙ্গের হোমর,
আজি তাঁরে সমাদরে
বঙ্গবাসী পূজা করে!
পাষাণে চিত্রিত ওই সমাধির উপর—
শ্রীমধুসূদন দত্ত অক্ষয় অমর!

(কাব্য কুসুমাঞ্জলি)

প্রসিদ্ধ লিউলিন কোম্পানী নির্মিত এই স্তম্ভটি ভাস্কর্যে অপূর্ব। স্তম্ভের একপাশে মধুসূদনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইংরেজিতে লেখা। অপর পার্শ্বে কবির বিখ্যাত সমাধিলিপিটি খোদাই করা—

দাঁড়াও পথিক বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরের সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যুগগুরু রামমোহনকে তাঁর ইচ্ছামত ব্রিস্টলে তিনি যে বাড়িতে থাকতেন তারই উদ্যানে সমাধিস্থ করা হয়। সমাধির স্মৃতিফলকে ভারতবর্ষের যুগসূর্য

রামমোহনের যোগ্য ভূমিকার কথাটি ইংরেজিতে লেখা হয় এবং সবশেষে এই কটি লাইন যোগ করা হয়—

THIS TABLET
RECORDS THE SORROW AND
PRIDE WITH WHICH HIS MEMORY
IS/CHERISHED BY HIS DECENDANTS

পরবর্তীকালে অবশ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের দেহাবশেষ তুলে নিয়ে গিয়ে আনলোস ভেল-এ একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন।

মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁর সমাধিলিপি নির্বাচন করে গেছেন। 'আত্মচরিতে' তিনি লিখেছেন—"আমার সমাধিমন্দিরে আমার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বাক্য কয়েকটি লিখিত থাকিবে—

'প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সংকার্যের জীবন, প্রীতি ধর্মপ্রচারের একমাত্র উপায়।' স্বদেশী লোকের মন বিদ্যাদ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে। অজ্ঞান ও অধর্ম হইতে নিস্কৃতি পাইবে। জ্ঞানামৃত পাম ও যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতি সমূহের মধ্যে গণজাতি হইবে এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্য ক্তকি আনন্দিত থাকেন।"

স্যার রাসবিহারী ঘোষও বলতেন—তাঁর মৃত্যুর পর যেন তাঁর শ্মশানের ওপর মন্দির করে লিখে দেওয়া হয়।

After life's fitful fever, he slept well.

মৃত্যুর পর পৃথিবী থেকে কেউ মুছে যেতে চান, কেউ চান মৃত্যুর পর পৃথিবীতে তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন থাকুক। স্রষ্টাদের উদ্দেশ্যে নির্মিত এইসব সমাধিস্তম্ভ এবং উৎকীর্ণ লিপি কেউ অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। কেউ আবার এগুলি চিরন্তন আনন্দের স্থান বলে মনে করেন। স্রষ্টার জন্যে আবার স্মৃতি-ফলকের প্রয়োজন কি, সৃষ্টির মধ্যে রসজ্ঞ পাঠকের হৃদয়েই তো তিনি চিরজীবী হয়ে থাকেন; এ-সব যুক্তিও কেউ কেউ দেখান!

সমাধিস্তম্ভ বা ফলক নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার যুক্তিতর্কে যে-মতই শক্তি-শালী হোক না কেন—এসব বিচিত্র সমাধিলিপি পাঠ করে যে আমরা আনন্দই পাই এবং সাহিত্যের বিচিত্র ধারায় এটিও যে একটি বিশিষ্ট ধারা সে কথা বলাই বাহুল্য।